সূচীপত্র

পূর্ব কথা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يا ايها ا لنَّا سُ ا تَّقُوْ ا رَبَّكُمُ ا لَّذِ خَلَقَكُمْ مّن نَّفسْشِ وَّ ا حِدَ ةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوَ جَها وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِ
جَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَا ءً - وَا تَّقُوْاللهَ ا لَّذِ ى تَسَا ءَ لُوْنَ بِه وَ ا لاْ رْ حَا مَ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট পাওনা চেয়ে থাক। আর আত্মীয়- স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা)

তাফসীরঃ সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী কারো নিজ বংশের ছেলে-মেয়ে এবং ইয়াতীম আত্মীয়- স্বজনদের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভুতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তুলাদন্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ণয় করা দুস্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ ভীতি এবং আখিরাতের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে তাকওয়া। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন, হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর।"

সম্ভবত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিবাহের খুতবায় এই সূরাটি পাঠ করতেন। বিবাহের খুতবায় আলোচ্য

আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত। বিশেষ ভাবে উল্লেখ যে, এখানে 'হে মানবমন্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে সমস্ত মানুষই- চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী-কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্য হতে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্ত্বার বিরুদ্ধাচরণ করা কি সম্ভব হতে পারে যিনি সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রুবুবিয়্যাত বা পালন নীতির দৃষ্টান্ত প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান। এর পরই আল্লাহতা'আলা মানব সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন; আর তা হচ্ছে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ অর্থাৎ হযরত আদাম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করে পরষ্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন। আল্লাহভীতি ও পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারষ্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, ধনী-গরীবের ব্যবধান ভুলে যেয়ে সকলে যেন একই মানদন্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়। (মা'আরিফুল কুরআন)

বিবাহের ফজীলত

মহান রাব্বুল 'আলামীন সৃষ্টিজগতের সকল কিছুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তিনি মানবজাতিকে তৈরী করেছেন। তাদেরকে নারী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সৃষ্টিগত ভাবেই এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুশৃংখল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই বিপরীতমুখী দুই শ্রেণীর পারষ্পরিক সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি শরী'আতে বিবাহ নামক বন্ধন ব্যবস্থার আদেশ দিয়েছেন।

বিবাহ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, এতদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, “বান্দা যখন বিবাহ করল তখন তার দ্বীনদারী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।” (মিশকাত শরীফ -২৬৭)
মানুষের অধিকাংশ গুনাহ দুটি কারণে সংঘটিত হয়। একটি হয় তার লজ্জাস্থানের চাহিদা পূরণের কারণে আর অন্যটি হয় পেটের চাহিদা পূরণের কারণে। বিবাহের কারণে মানুষ প্রথমটি থেকে হেফাজতের রাস্তা পেয়ে যায়। সুতরাং তাকে কেবল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তান্বিত থাকতে হয়। যাতে করে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারে। একজন লোক খুব বড় আবেদ, তাহাজ্জুদ-চাশত-আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায খুব পড়ে; কিন্তু সংসারের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আরেকজন লোক ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করে এবং বিবি বাচ্চার হক আদায়ে তৎপর থাকে ফলে তার বেশী বেশী নফল পড়ার কোন সময় হয় না। এতদসত্বেও শরীআত কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই ইবাদাতগুজার হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত মুতাবিক বিবাহ-শাদী করে পরিবারের দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হালাল রিযিকের ফিকির করছে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল- যে চব্বিশ ঘন্টা মসজিদে পড়ে থাকে বা বনে জঙ্গলে সন্যাসীর মত জীবন যাপন করে আর সব রকমের সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকে।
বিবাহের অন্যতম আরো একটি ফায়েদা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা রাসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ পালন করা হয়। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ “বিবাহ করা আমার সুন্নাত।” আরেক হাদীসে এসেছেঃ“ তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ আছে, তারা বিবাহ কর।কারণ এর দ্বারা দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হেফাজত হয়।”
(মিশকাত শরীফ- ২৬৭ পৃঃ)
এছাড়াও বিবাহের দ্বারা মানুষ নিজেকে অনেক গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আওলাদ হাসিল করতে পারে। আর নেক আওলাদ এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরে কঠিন অবস্থার উত্তরণে পরম সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। কারো যদি নেক সন্তান থাকে তাহলে তারা যত নেক

আমল করবে, সেগুলো পিতা-মাতার আমলে যোগ দেয়া হবে। বিবাহ-শাদী যেহেতু শরীআতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত, সেহেতু এর মধ্যে কোনভাবে গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কোন সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া এতে বেপর্দা, নাচ-গান, অপব্যয়-অপচয়, ছবি তোলা, নাজায়িয দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণরুপে দুরে থাকতে হবে। নতুবা মুবারক বিবাহের সমস্ত বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সূচনাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ- ২/২৬৮)

বিবাহ সম্পর্কিত কিছু হাদীস

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ পাক আবশ্যক মনে করেন -

(১) ঐ মুকাতাব বা দাস যে নিজের মুক্তিপণ আদায় করতে চায়।

(২) ঐ বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং

(৩) ঐ মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

(তিরমিযী শরীফ, মিশকাত-২৬৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার আভিজাত্যের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অপমান ও অপদস্ততা অধিক হারে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তাকে বিবাহ করবে, আল্লাহ পাক তার দারিদ্রতাকে (দিনে দিনে) বৃদ্ধি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার বংশ কৌলিণ্য দেখে, আল্লাহ পাক তার তুচ্ছতা ও হেয়তা বাড়িয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে শুধুমাত্র এই জন্য বিবাহ করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে অথবা (আত্মীয়দের মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ সেই নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনেই বরকত দান করবেন। (তাবারানী)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ নারীকে চার কারণে বিবাহ করা

হয়। (১) তার ধনের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দ্বীনদারীর কারণে। সুতরাং তুমি দ্বীনদার বিবি লাভ করে কামিয়াব হও। তোমাদের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও (যদি দ্বীনদার ব্যতিত অন্য নারী চাও)।(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-২৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নেককার বিবি। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত- ২৬৭)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনদারী ও আখলাক তোমরা পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও। (মাল সম্পদের প্রতি লক্ষ্য কর না) তা যদি না কর তাহলে দেশে ব্যপকহারে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেবে।(তিরমিযী, মিশকাত শরীফ- ২৬৭)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিবাহ হলো, যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পাদিত হয়। (বাইহাকী, মিশকাত শরীফ- ২৬৮)

শরী'আতের দৃষ্টিতে বিবাহ

ইসলামে বৈরাগ্য জীবন যাপনের কোন অবকাশ নেই। যাদের মনের চাহিদা স্বাভাবিক তাদের জন্য বিবাহ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর যাদের মনের চাহিদা এমন যে, বিবাহ না করলে নিজেকে সহজে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না- তাদের জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এরূপ আশংকা করে যে, সে স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবে না, তার জন্য বিবাহ করা হারাম।

(ফাতাওয়ায়ে শামী- ৩/৬ , কাশফুল খফা-২/২৬৮)

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরী'আতের দৃষ্টিতে লক্ষ্যণীয় বুনিয়াদী বিষয় হল দ্বীনদারী। এরপর সৌন্দর্য্য, ধন-সম্পদ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আনা যায়। এই তিন জিনিষ বা এর কোনটি থাকলে ভাল, না থাকলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, এগুলি ক্ষণস্থায়ী। আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বীনদারী হচ্ছে মানুষের প্রকৃত ও স্থায়ী সম্পদ। যার মধ্যে দ্বীনদারী নেই তার মধ্যে বাকি তিনটি জিনিষ পূর্ণমাত্রায় থাকলেও বলা যায় যে, তার কিছুই নেই। আল্লাহ ও তার রাসুলের তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপনকারী সর্বাধিক পছন্দনীয়।(মিশকাত শরীফ- ২/২৬৭)

তাছাড়া পাত্রের মধ্যে দ্বীনদারী না থাকলে তার দ্বারা সঠিকভাবে স্ত্রীর হক আদায়ের আশা করা যায় না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যাদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব রয়েছে তারা স্ত্রীর কোন হক আদায়ের ব্যাপারে পরোয়া করে না। ছেলের মধ্যে যত যোগ্যতাই থাকুক না কেন, দ্বীনদার না হলে তার সাথে মেয়ের বিবাহ দেয়া উচিৎ নয়। তেমনিভাবে পাত্রীর মধ্যে দ্বীনদারী না থাকলে তার দ্বারা স্বামীর হক আদায়ের আশা করা যায় না, চাই অন্য দিক যতই উন্নত থাকুক না কেন!

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ, তা হলোঃ এমন বংশের মেয়ে বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়, যে বংশের মেয়েরা অধিক সন্তান জন্ম দানে সক্ষম ও অধিক স্বামী ভক্ত। কেননা, কিয়ামতের ময়দানে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবেন। এজন্য তিনি উম্মতকে এধরনের পাত্রী নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন যারা স্বামীকে মুহব্বত করে এবং বেশী সন্তান জন্মদান করে। সুতরাং প্রচলিত পদ্ধতির জন্মনিয়ন্ত্রন সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহকে রিযিকদাতা বলে অবিশ্বাস করার শামিল। হ্যাঁ, ব্যক্তিগত ওজর বা সমস্যার কারণে মুফতিয়ানে কেরামের অভিমত নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করার অবকাশ আছে। (মিশকাত শরীফ-২/২৬৭)

পাত্রী দেখা সংক্রান্ত মাসআলা

পাত্রী দেখা শরী‘আতের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব। মহরের পরিমাণসহ সবকিছু পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পরে গোপনীয়ভাবে শুধুমাত্র পাত্র পাত্রীর চেহারা দেখতে পারবে। বিস্তারিত দেখতে হলে ছেলের উচিত তার বংশীয় মহিলাদেরকে পাঠানো। বর্তমানে যেমন ছেলেরা ঘটা করে নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, এটা শরী‘আতে সম্পূর্ণ নিষেধ। কেননা, ঘটনাক্রমে যদি এ ছেলের সাথে মেয়ের বিবাহ না হয় তাহলে সেটা মেয়ের জন্য চরম মানসিক আঘাতের কারণ হয়। পাত্রী তো আর খোলা বাজারের মাছ-গোশত নয় যে, যেই দেখতে ইচ্ছা করবে তাকে দেখানো হবে, মন চাইলে কিনবে, না চাইলে না কিনবে। পাত্রী তো আশরাফুল মাখলুকাত, মাতৃজাতি- তার ইয্যত সম্মান রক্ষা করা সকলের কর্তব্য।

বিবাহের পূর্বে বর-কনের সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক

বর্তমানে অনেক জায়গায় বিবাহের ক্ষেত্রে বর-কনের পারস্পরিক পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা করা হয় না। যার সাথে দুটি মানুষের সারা জীবনের সুখ-দুঃখের সম্পর্ক সে ক্ষেত্রে তাদের মতামত না নিয়ে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় তৃতীয় পক্ষ, আশ্চর্যই বটে!! অনেক ক্ষেত্রে তো প্রবল আপত্তি সত্তেও একরকম জবরদস্তীই তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়া হয়। এভাবে তাদের সকল সুখ-স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে বিরোধপূর্ণ এক ভবিষ্যতের দিকে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়। এমনটি করা শুধু শরীআতের দৃষ্টিতেই নয় বরং সুস্থ বিবেকেরও পরিপন্থি। এ জাতীয় বিবাহের পরিণতি খুব একটা সুখকর হয় না। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়

শরী‘আতে বিবাহের লেন-দেন সম্পর্কে এতটুকু বলা হয়েছে যে, ছেলে নিজের সংগতী অনুযায়ী মোহর দেবে এবং স্ত্রীর সাথে মুলাকাত হয়ে

যাওয়ার পরে সামর্থ অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদেরকে ওলীমা খাওয়াবে। বিবাহের খরচ এই দুটিই- এবং দুটিই ছেলের দায়িত্বে। আর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপার তো আছেই।

সুতরাং থাকার জন্য একটা ঘর, পরার জন্য কাপড় চোপড় আর খানাপিনার ব্যবস্থা সারাজীবন করতে হবে। রাসুলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীদের থাকার জন্য ঘর, খাওয়া-পরার জন্য খাদ্য-বস্ত্র সবই ইনসাফের সাথে দিয়ে গেছেন। শরী'আতে মোহরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। প্রত্যেকে নিজের সাধ্যানুযায়ী মোহর ধার্য করবে। মোহরের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হচ্ছে আড়াই ভরি রুপার দাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য পাঁচশত টাকা (১৯৯৯ ঈসায়ী)। আমাদের সমাজে যে প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, ছেলের সামর্থ থাক বা না থাক দুই লাখ, পাঁচ লাখ, সাত লাখ এরকম একটা কিছু নির্ধারণ করা হয়- শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি জায়িয নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি এই নিয়তে মোটা অংকের মোহর নির্ধারণ করে যে, এর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পাবে কিন্তু তার আদায় করার নিয়ত না থাকে , তাহলে এটা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কানযুল উম্মালের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে " ঐ ব্যক্তি হাশরের ময়দানে ব্যভিচারীদের কাতারে উঠবে এবং ঐ অবস্থায় তাকে আল্লাহ পাকের সামনে হাজির করা হবে। (১৬/৫৪২)

স্ত্রীর নিকট থেকে যদি মোহর মৌখিকভাবে মাফ করিয়ে নেয়া হয় বা এর জন্য কোন পলিসি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা জায়িয হবে না। তাছাড়া মৌখিক মাফ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিকতার কারণে হয়ে থাকে। আর এটা পুরুষের আত্মমর্যাদা বোধেরও পরিপন্থী। তবে কোন স্ত্রী যদি আন্তরিক সন্তুষ্টির সাথে মাফ করে দেয় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা।

মোহরের মধ্যে বিবির সম্মতিতে শুধুমাত্র অলংকারকে শামিল করা যাবে। তবে বিবাহের সময়ে বা পরে যদি মোহরের টাকা থেকে অলংকার দান করা হয় তাহলে স্ত্রীকে সেটা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে যে, এটা মোহরের টাকা থেকে দেয়া হচ্ছে। দেয়ার সময় কোন কিছু না বলে পরে বলা যে, 'ওটা মোহর থেকে দিয়েছি' খুবই অন্যায় কথা। পাত্র পক্ষের লেন-দেনের মধ্যে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ওলীমা। ওলীমা সুন্নাত। বিবাহের পরে পাত্রপক্ষ এর ব্যবস্থা করবে। ছেলে নিজের সামর্থ

অনুযায়ী এই ওলীমার ব্যবস্থা করবে। কারো সামর্থ থাকলে বকরী জবাই করে খাওয়াবে। না পারলে মুরগী জবাই করে খাওয়াবে। তাও যদি না পারে তাহলে কমপক্ষে কিছু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবে। ওলীমা পেট পুরে খাওয়াতে হবে - এমনটি কোন জরুরী নয়। আর এজন্য ধার-কর্জেরও অনুমতি নেই। মোট কথা মোহর ও ওলীমা এই দুটি বিষয়ই হচ্ছে বিবাহে লেন-দেনের অংশ। আর উভয়টিই ছেলের যিম্মায়। (মিশকাত শরীফ- ২৭৮)

প্রচলিত আরেকটি লেন-দেন পাত্রপক্ষ অন্যায়ভাবে পাত্রীপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়, যেটাকে যৌতুক বলা হয়। ছেলেকে ঘড়ি, হোন্ডা, জাহান্নামের একটা বাক্স (টি,ভি) ইত্যাদি দেয়ার দাবী করা হয়। মেয়ের বাপের উপর চরম জুলুম করে তা আদায় করা হয়। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে- কোন মুসলমানের মাল তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতিত নিলে তা হালাল হবে না। (মিশকাত শরীফ-২৫৫)

আবার কখনো পাত্রপক্ষ এমনও দাবী করে যে, বরের সাথে বরযাত্রী হিসেবে ৫০ বা ১০০ জন লোক আসবে। তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে। শরী'আতে এটাও নাজায়িয। (ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-৭/৩১৮)

বরযাত্রা

এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের সমাজে বরযাত্রার নামে যে ধুমধাম করা হয় তা শরী'আতে অনুমোদিত নয়। এ উপলক্ষ্যে পালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুনাহর ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এধরনের আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। একজন পিতা নিজের সবটুকু সংগতি দিয়ে নিজের আদরের দুলালীকে বিয়ে দিয়ে দুরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা তার জন্য কত বড় একটা মর্মযাতনা। এরমধ্যে যদি আবার জমি-জায়গা বিক্রি করে কিংবা বন্ধক রেখে বরযাত্রীদের আপ্যায়নের টাকা যোগাড় করতে হয় তাহলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে?

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও বুযুর্গ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ) একটি হাদীসের ভিত্তিতে বলতেন, এটা হচ্ছে ডাকাতির শামিল। এ ধরনের খানা থেকে দূরে থাকা চাই।

অনেক সময় দেখা যায় কনে পক্ষ নিজেদের পক্ষ হতে নির্ধারিত সংখ্যক লোকের মেহমানদারীর দায়িত্ব নিলে ছেলেপক্ষ তার চেয়ে বেশী লোকজন সাথে নিয়ে হাজির। এভাবে বিনা দাওয়াতে কারো বাড়ী যেয়ে হাজির হওয়া জায়িয নাই। হাদীসে আছে " যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে গেল সে চোর হয়ে প্রবেশ করল আর লুটেরা হয়ে বেরিয়ে এল। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি চোর ও লুটেরার মত গুনাহগার হবে।

এখন বাকি রইল অলংকারের মাসআলা। শরী'আতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, স্বামী তার স্ত্রীকে অলংকার দিতে পারে- কিন্তু দেয়াটা কোন জরুরী বিষয় নয়। আর মেয়ের বাপকে এব্যাপারে চাপ দেয়া যাবে না বা কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। মেয়ের পিতা যদি স্বেচ্ছায় কিছু দেয় তাহলে তা জায়িয। না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েকে বেশী পরিমাণে অলংকার দিয়ে তাকে এক প্রকার বিপদেই ফেলে দেয়া হয়। কেননা, বছর বছর যাকাত দেয়ার দায়িত্ব তখন মেয়ের যিম্মায় চলে আসে। আর চোর-ডাকাতের বাড়তি ঝুঁকি তো আছেই।

উম্মুল মুমিনীনগণ (রাঃ) হাতির দাঁতের অলংকার পরিধান করতেন। মাঝে মধ্যে কেউ স্বর্ণের অলংকার ব্যবহার করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অপছন্দ করতেন। প্রকৃতপক্ষে মুমিন নারীদের জন্য অধিক জেওরাসক্তি শোভনীয় নয়।

বিবাহের স্থান ও কাল

বিবাহের জন্য উত্তম হলো জুমু'আর দিন। পঞ্জিকায় যে শুভ অশুভ সময় লেখা আছে, সেটা হিন্দুদের তরীকা। শরীআতের দৃষ্টিতে যে কোন মাসে, যে কোন দিনে এবং যে কোন সময়ে বিবাহ বৈধ। তবে শাওয়াল মাসে এবং জুম'আর দিনে বিবাহ করা সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮)

বিবাহের জন্য সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদ। প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে মুসলমানদের বিবাহ মসজিদেই সম্পন্ন হত। আর এটা নবীজীর সুন্নাতও বটে। শাওয়াল মাসে বিবাহ করা আরেকটি সুন্নাত। সুতরাং কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে শাওয়াল মাসের জুমু'আর দিনে বিবাহ করবে। আর সম্ভব না হলে অন্য যে কোন

সময়ে করতে পারে। তবে সম্ভব হলে মসজিদ ও জুমু'আ ঠিক রাখবে, এটাও সম্ভব না হলে দুটোর কোন একটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ খায়ের ও বরকত থেকে মাহরুম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদের বিবাহে সুবিধা হলো, এতে কোন ফালতু খরচ হয় না। বিছানা-পত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দাবী-দাওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের জায়গা, সেখানে মানুষ ইবাদত করতে আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করতে আসে। কাজ শেষ হলেই চলে যায়। (মিশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৩/২৬৫)

কনের ইযন বা সম্মতি প্রদান

বিবাহের জন্য কনের ইযন বা সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক। কনের ইযন গ্রহণের জন্য তার পিতা, চাচা, মামা বা যে কোন একজন মাহরাম যথেষ্ট। শরীআতে ইযন গ্রহণের জন্য কোন স্বাক্ষীর প্রয়োজন নেই। যে ইযন আনবে তাকে বলতে হবে - অমুক ছেলে, তার শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক অবস্থা এই, এত পরিমাণ মোহর ধার্য সাপেক্ষে তোমার সাথে তার বিবাহ হবে- তুমি কি এতে রাজি আছ? মেয়ে যদি কুমারী হয় তাহলে তার চুপ থাকা, ক্রন্দন করা, হাসা বা মৌখিক সম্মতি এসব কিছুই তার রাজি থাকার ইঙ্গিত বহন করে। আর মেয়ে যদি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাহলে স্পষ্ট সম্মতি জরুরী।

আমাদের দেশে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, পাত্রপক্ষের দুজন স্বাক্ষী এবং মেয়ের পক্ষের দুজন স্বাক্ষী একত্রে মেয়ের কাছে যেয়ে অনুমতি নিয়ে আসে। খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, এর কোন প্রয়োজন নেই। শরীআতে এর কোন ভিত্তি নেই। কেননা, এখানে পর্দাহীন কাজ করা হচ্ছে। ছেলে পক্ষের যে দুজন মেয়ের সামনে যাচ্ছে তাদের জন্য তো উক্ত মেয়েকে দেখা জায়িয নাই। আরো পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেক আনাড়ী কাজীও এই সব স্বাক্ষীদের সাথে মেয়ের সামনে যেয়ে হাজির হয় এবং তাকে প্রস্তাব দেয় ও সই-স্বাক্ষর গ্রহণ করে। এটা মোটেও জায়িয নেই। (তিরমিযী শরীফ-১/২১০, হিদায়া-২/৩১৫.৩৪১)

বিবাহ

ইসলামী শরীআতে বিবাহের জন্য কাউকে ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়না। মেয়ের ইযন নিয়ে তার উকিল দুজন স্বাক্ষীর সামনে ছেলেকে প্রস্তাব দেবেন। তখন ছেলে কবুল করবে। আগে খুতবা পড়ে তারপরে ইজাব কবুল করতে হবে। ব্যস, এতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। বিবাহের পরে উপস্থিত সকলে বলবে " বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর"। (মিশকাত-২/২৭৮)

উল্লেখ্য যে, বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকা আবশ্যক। স্বাক্ষীদের নিজ কানে ইজাব-কবুলের কথাগুলি শুনতে হবে। এরপরে ছেলে বা মেয়ে যার এলাকায় বিবাহ হবে সে এলাকার লোকেরা উপস্থিত লোকদের মধ্যে কিছু খুরমা বিলিয়ে দেবে।

খুরমা বিতরণ হয়ে গেলে সকলে চলে যাবে, কেউ বসে থাকবে না। তবে দূর পথের সফর হলে বরের সাথে সাহায্যকারী হিসেবে দু চারজন সাথী থাকতে পারে। (মিশকাত-২/২৭৮) ইজাব কবুলের পরে বর উঠে দাঁড়িয়ে বা বসে উপস্থিত সকলকে সালাম করে- শরীআতে এর কোন ভিত্তি নেই।

শরীআতে উকিল বাপ বলে কিছু নেই

আমাদের দেশে আরো একটি শরীআত বিরোধী প্রথা এই দেখতে পাওয়া যায় যে, মেয়ের জন্য একজন উকিল বাপ নির্ধারণ করা হয়। সেই ব্যক্তি মেয়ের নিকট থেকে অনুমতি আনে এবং বিয়ের মজলিসে এসে মেয়ের সম্মতির কথা জানায়। এই উকিল বাপকে এতই গুরুত্ব দেয়া হয় যে, এটা না হলে বিবাহ হবেনা মনে করা হয়। পরবর্তীতে এই উকিল বাপকে মেয়ে নিজের বাপের মত সম্মান করে এবং তার সাথে পর্দা পুশিদা করার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রে উকিল বাপ কিন্তু এমন ব্যক্তিই হয়ে থাকে যার সাথে উক্ত মেয়ের দেখা-সাক্ষাতই জায়িয নেই। এতে করে উভয়েই গুনাহগার হয়ে থাকে। সুতরাং খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে, শরীআতে উকিল বাপের কোন ধারণা নেই। এটাকে

জরুরী মনে করা এবং এভাবে পরপুরুষের সামনে বে-পর্দা হওয়া একেবারে হারাম। মেয়ের নিকট থেকে অনুমতি নেয়ার জন্য তার আপন বাপ-ভাই যথেষ্ট।

বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে স্বামীর ব্যবহার

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একের প্রতি অন্যের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। এর সবটাই দুনিয়া আখিরাতের শান্তি ও কামিয়াবীর জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত সুন্দর ব্যবস্থা। প্রত্যেক বিবেকবান স্বামীকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আজ থেকে আমাদের দুজনের ৬০/৭০ বছরের দীর্ঘ এক সফর শুরু হয়ে গেল। আর শরীআতের মাসআলা হচ্ছে, ২/৪ জনের কোন সফর যদি মাত্র এক ঘন্টার জন্যও শুরু হয় তাহলে তাদের মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে হবে। আর এখানের তো দীর্ঘ দিনের সফর। কাজেই একজনকে নেতৃত্ব দেয়া প্রয়োজন। শরীআতে স্বামীকে আমীরের আসন দিতে বলা হয়েছে। আর আমীর সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ হল "সায়্যিদুল কাওমি খাদেমুহুম" অর্থাৎ যিনি আমীর হবেন তিনি মানুষের খিদমত করবেন। বুঝা গেল যে, স্বামীকে কর্তৃত্ব দেয়া দ্বারা নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং স্ত্রীর ও সন্তানাদীর লালন-পালনের পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর উপর আরোপ করা হয়েছে। শরীআতের অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটি এভাবে বলা যায় যে, স্বামী হল আশেক আর স্ত্রী তার মাহবুবা বা প্রেমাস্পদ। আর দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, আশেক স্বীয় মা'শুককে সর্বদা আরামে রাখার চেষ্টা করে। কাজেই স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে সাধ্যমত আরাম পৌছানের জন্য সচেষ্ট থাকবে এবং তাকে আল্লাহওয়ালী বানানোর চেষ্টা জারী রাখবে।

আল্লাহ পাক স্বামীকে উদ্দেশ্য করে আদেশ দিচ্ছেন, দেখো ! আমার এই বান্দীকে আমি সৃষ্টি করেছি। বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়েছি। অতঃপর আমি নিজে তোমার জন্য তাকে নির্ধারিত করেছি। কাজেই তুমি তাকে আমার দেয়া নেআমত মনে করে তার সাথে কোমল ব্যবহার কর। তার দোষ ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। আল কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছেঃ "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সুরা নিসা, আয়াত- ১৯)

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। এক লোকের কাছে পুলিশের আই.জি. ফোন করে বলল, ভাই! শুনলাম আমার মেয়ের বান্ধবীকে নাকি তুমি বিবাহ করেছ? ওদের দুই বান্ধবীর মধ্যে কিন্তু খুব চমৎকার সম্পর্ক। সুতরাং তুমি তার প্রতি খেয়াল রেখ, যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়। এই ফোন পাওয়ার পরে ঐ ব্যক্তি কিন্তু সতর্ক হয়ে যাবে। আগের চেয়ে আরো বেশী ভাল ব্যবহার করবে স্ত্রীর সাথে। তার সমস্যা সমাধানের জন্য নিজ থেকেই উদ্যোগী হবে। সামান্যতম জুলুম-অত্যাচারের চিন্তাও তার মনে আসবে না। কেননা, তার পিছনে পুলিশ কর্মকর্তা আছে। সামান্য একজন পুলিশের কথায় যদি একজন মানুষ এমন নিষ্ঠাবান হয়ে যায় তাহলে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে আমাদের কি করণীয় তা সহজেই অনুমেয়।

আকাবিরে দেওবন্দের জনৈক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি অভিযোগ করল যে, আমার স্ত্রী আমাকে খুব জ্বালাতন করে, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। উত্তরে তিনি বললেন, শোনো! সে যদি তোমাকে কষ্ট দেয় তাহলে এই মহিলারাই কিন্তু আবার অনেক লোককে আল্লাহর অলী বানিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি আল্লাহর অলী হতে চাও তাহলে সবর কর। আর যদি না চাও তাহলে তালাক দিয়ে দিতে পার।

হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁ অনেক বড় এক বুযুর্গ ছিলেন। একদিন স্বপ্নে তাকে বলা হল, দিল্লির অমুক বস্তিতে খুব দ্বীনদার এক মহিলা আছে, তবে সে খুব বদ মেযাজী। তুমি যদি তাকে বিবাহ করে তার বদ মেযাজীর উপর সবর করতে পার, তাহলে তোমাকে আল্লাহর অলী বানিয়ে নেয়া হবে। পরের দিনই তিনি সেই মহিলাকে বিবাহ করে গৃহে নিয়ে এলেন। তিনি স্বীয় মুরীদদেরকে বলতেন, দেখো! আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ায় আমার যে ডংকা বাজিয়ে দিয়েছেন, তা এই মুজাহাদা আর সবরের কারণেই।

শাইখ আবুল হাসান খোরাসানীও উঁচু দর্জার একজন বুযুর্গ ছিলেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি দেখতে পেল যে, তিনি একটা সাপ দিয়ে লাকড়ীর বোঝা বেঁধে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাড়ীর দিকে আসছেন। লোকটি অবাক হয়ে তার এই পর্যায়ে পৌছার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এসবই আমার বদমেযাজী স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের পুরস্কার।

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য স্বামীকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনই স্ত্রীকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্বামীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য। বলা হয়েছে, সে যেন স্বামীকে পেরেশান না করে, তার সামর্থের বাইরে তার উপর কোন দাবী-দাওয়া না চাপিয়ে দেয়। বরং স্বামীর আরামের প্রতি যেন তার সর্বদা লক্ষ্য থাকে। স্বামী যেন কখনো তার উপর অসন্তুষ্ট না থাকে। কেননা, স্বামী অসন্তুষ্ট থাকলে উক্ত নারীর ইবাদত কবুল হয়না এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর লা'নত করতে থাকে।
স্বামীর মর্যাদা বুঝাতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ "আমার শরীআতে যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকত তাহলে আমি নির্দেশ দিতাম মহিলারা যেন আপন আপন স্বামীকে সিজদা করে।"
নারীদের জান্নাতে যাওয়া পুরুষদের তুলনায় অনেক সহজ। কোন মুমিনা মহিলা যদি নিম্নোক্ত ৪টি কাজ যথাযথ ভাবে পালন করে তাহলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেয়া হবে। কাজ ৪টি হলঃ-
১। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে আদায় করা।
২। রমজান মাসের রোযা রাখা।
৩। স্বামীকে শরীআতের গন্ডীর মধ্যে থেকে খুশি রাখা।
৪। পর্দায় থেকে নিজের ইজ্জত-আব্রুর পরিপূর্ণ হিফাজত করা।
এই চারটির কোনটিই কিন্তু অসম্ভব বা কঠিন কাজ নয়। কাজেই প্রতিটি নারীর উচিৎ বেহেশতের মধ্যে আপন স্থান সুনিশ্চিত করা।

শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্তব্য

শ্বশুর-শাশুড়ীর একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, যে মেয়েটি বধূ বেশে সংসারে নতুন এসেছে, সে একদমই নতুন এবং এই পরিবেশ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। সুতরাং আপন সন্তানকে ঠিক যে ভাবে তা'লীম দেয়া হয়, তার আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়- তাকেও ঠিক সেভাবেই গড়তে হবে এবং তার আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। মেয়ের জামাতাকে মেয়ের পিতা-মাতা নিজেদের একজন ছেলে ভাববেন এবং

নিজেদের ছেলের মত তাকে গড়ে নিবেন আর তার ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বর্তমানে আমাদের অবস্থাতো এই যে, নতুন একজন সংসারে এলে বিশেষ করে সে যদি হয় বাড়ীর বউ- তাহলে পদে পদে তার ভুল-ত্রুটি বের করার চেষ্টা করা হয়। অথচ এটা মস্ত বড় অন্যায়। তাকে যদি নিজের সন্তানের মত মনে করা হয় তাহলে কিন্তু অতি সহজেই সকল বিবাদের সমাধান হয়ে যায়। আরো মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রীর যিম্মায় স্বামীর ঘরে অবস্থান করার যিম্মাদারী দেয়া হয়েছে, স্বামীকে খুশি রাখার যিম্মাদারী দেয়া হয়েছে। অন্যান্য কাজ কর্মের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়নি, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমতের দায়িত্বও স্ত্রীর নয়। ছেলে নিজে তাদের খেদমত করবে কিংবা লোক দ্বারা করাবে। স্ত্রীকে একাজে বাধ্য করতে পারবে না। সুতরাং কোন ভাগ্যবতী মহিলা যদি শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করে, তাহলে এজন্য তাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

১) সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ তথা ভরণ-পোষণ দিতে অবহেলা না করা এবং স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। যেমন, পৃথক একটি কামরা দেয়া।

২) স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়িল শিখাতে থাকা এবং নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকা।

৩) স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করা, ভাল ব্যবহার করা, ছোট খাট বিষয় নিয়ে অহেতুক রাগ না করা।

৪) মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া।

৫) খামাখা স্ত্রীর প্রতি কু-ধারণা পোষণ না করা এবং তার ব্যাপারে একেবারে উদাসীনও না থাকা।

৬) খরচের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। কৃপনতা না করা আবার বেহুদা খরচেরও অনুমতি না দেয়া।

৭) প্রয়োজন অনুপাতে তার মানবিক চাহিদা পূরণ করে তার দিল-দেমাগ ও দৃষ্টিকে গুনাহ থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা করা এবং তা সাধারণভাবে সপ্তাহে একবার হওয়া ভাল। আর প্রতি চার মাসে একবার হওয়া জরুরী।

দাম্পত্য জীবনে কামিয়াবী ও পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি হাসিলের জন্য কুরআন-হাদীসের আলোকে বর্ণিত পদ্ধতি জানা আবশ্যক। সেসব পদ্ধতি হচ্ছেঃ- (ক) দু'আ পড়ে প্রথমে ভুমিকা সমূহ অবলম্বন করবে (খ) ধীর স্থীরতা একান্ত জরুরী (গ) স্বামীর অবস্থান উপরে হবে {সুরা আ'রাফ-১৮৯} (ঘ) স্বামীর ভর নিজের হাতের উপরে হবে, সীনা মিলাবে না।{বুখারী শরীফ হাদীস নং-৫১৮৯} (ঙ) স্ত্রী পা উঠিয়ে ভাজ করে পায়ের পাতাদ্বয় নিতম্বদ্বয় এর নিকটবর্তী রাখবে। {বুখারী শরীফ-হাদীস নং ২৯১} এ ব্যাপারে অবশিষ্ট মাসায়িল 'নবীজীর সুন্নাত' নামক কিতাবে দেখুন।

৮) অন্তরঙ্গ মূহুর্তে তার সাথে যেসব কথাবার্তা হয় তা অন্য কারো নিকট কোন অবস্থাতেই প্রকাশ না করা।

৯) নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাকে কিছু হাত খরচ দেয়া এবং তাকে সেই টাকা তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বৈধ খাতে খরচের অনুমতি দেয়া।

১০) প্রচলিত বিভিন্ন কুপ্রথা ও অনুষ্ঠান- যেখানে বেপর্দা বা অন্য কোন গুনাহ হয়ে থাকে - সেখানে যেতে বাধা দেয়া।

১১) তার অসাবধানতা বা বুদ্ধিমত্তার অভাবে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা। কখনো শাসন বা সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে ভারসাম্য বজায় রাখা।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

১) যথাযথভাবে স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। নিজের আদব-আখলাক ও সেবার মাধ্যমে স্বামীর মন জয় করা এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। তবে শরিআত বিরোধী কোন কাজ হলে তাতে অপারগতা প্রকাশ করা।

২) স্বামীর সামর্থের অতিরিক্ত কোন চাপ সৃষ্টি না করা।

৩) অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা।
৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে না যাওয়া।
৫) স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের কাউকে স্বামীর ঘরে আসতে না দেয়া।
৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা না রাখা, তেমনি ভাবে স্বামীর উপস্থিতিতে লম্বা সময় ধরে নফল নামায পড়তে হলে তার অনুমতি নিয়ে পড়া।
৭) স্বামীর সহবাসের জন্য আহবান করলে শরঈ কোন বাধা না থাকলে তার আহবানে সাড়া দেয়া।
৮) স্বামীর অসচ্ছলতা বা অসুন্দর আকৃতির জন্য তাকে তুচ্ছ না ভাবা।
৯) স্বামীর থেকে শরীআত বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পেলে আদবের সাথে তা বুঝিয়ে বলা।
১০) স্বামীকে মুরব্বী হিসেবে মান্য করা এবং তার নাম ধরে না ডাকা। তার সামনে রাগের সাথে বা বদ তমীযির সাথে তর্ক না করা।
১১) কারো সামনে স্বামীর বদনাম বা সমালোচনা না করা।
১২) স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনদের সাথে এমন ব্যবহার না করা যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষতঃ নিজের পক্ষ থেকে স্বামীর পিতা-মাতাকে সেবার পাত্র মনে করে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও খিদমত করা।
১৩) সন্তানদেরকে মায়া-মমতার সাথে লালন-পালন করা এবং তাদের খানা-পিনা, উযু-গোসল, পেশাব-পায়খানা, নামায-কালাম ইত্যাদির সুন্নাত তরীকা শিক্ষা দেয়া।

শশুর শাশুরীর হক বা তাদের প্রতি কর্তব্য

পুত্রবধূ বা মেয়ের জামাইয়ের প্রতি যেমন শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক কিছু কর্তব্য রয়েছে, তেমন তাদেরও এই নতুন পিতা-মাতার প্রতি বেশ কিছু কর্তব্য আছে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সর্বদা আপন পিতা-মাতার মত মনে করা উচিত। তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি সব সময় খেয়াল রাখা উচিত। তারা যদি বার্ধক্যে উপনীত হন তাহলে সাধ্যানুযায়ী তাদের খেদমত করা উচিত। শরী`আতের দৃষ্টিতে এই খিদমত যদিও ফরজ নয় তবুও মহিলাদের উচিত আপন স্বামীকে খুশি করার জন্য তাদের খিদমতের ব্যাপারে তৎপর হওয়া।

তেমনিভাবে ছেলেও নিজের শ্বশুর-শাশুড়ীর খোঁজ খবর রাখবে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদের সহায়তা ও খিদমত করবে।বিশেষ জরুরতে স্ত্রীকে তাদের নিকট সাময়িকভাবে থাকার অনুমতি দিবে।

সন্তানের হক

সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ পাকের বড় নি'আমত ও আমানত মনে করে তাদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য পালন করতে হবে। মাতা-পিতার উপর সন্তানের চারটি হক রয়েছে। যথাঃ

১। সন্তান যাতে আল্লাহর অলী হয় সেই ধ্যান-ধারণা রেখে আগে থেকেই একজন দ্বীনদার মহিলাকে বিবাহ করতে হবে। (মিশকাত শরীফ- ২/২৬৭)

২। সন্তান জন্মগ্রহণের পর কোন বুযুর্গ ব্যক্তি দ্বারা তাহনীক করিয়ে নেবে। তারপরে সপ্তম দিনে আকীকা করবে এবং শরীআত সম্মত সুন্দর নাম রাখবে। (মিশকাত-২/২৭১)

৩। বয়স হলে তাকে তা'লীম দেবে। যবান ফুটলে প্রথমে আল্লাহর নাম, বিসমিল্লাহ, কালিমায়ে তাইয়িবা শিক্ষা দেবে। ৫/৬ বছর বয়স হলে তাকে আদর্শ কোন মকতবে পাঠিয়ে কুরআন শরীফ ও জরুরী মাসায়িলের তা'লীম দেয়ার ব্যবস্থা করবে, যাতে সাত বছর বয়স হলে তাকে নামাযের আদেশ দেয়া যায়। কোন অবস্থায় এসব বিষয় না শিখিয়ে, মুসলমান না বানিয়ে বাংলা ইংরেজী লাইনে দিবে না। কেননা, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি নিজ সন্তান হত্যাকারী গণ্য হবে। ইংরেজী শিক্ষা দেয়া ওয়াজিব বা জরুরী নয়। কিন্তু কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দেয়া ফরজ। ইংরেজী শিক্ষা যদি হালাল রিযিক অন্বেষণ কিংবা দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য হয় তাহলে তা জায়িয আছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ইংরেজী শিখতে গিয়ে আবার ইংরেজ না হয়ে যায়। যে শিক্ষা বিজাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ আর বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে ঈমান- আক্বিদা, নামায, মাশাইখদের ব্যপারে উদাসীন করে সেই শিক্ষার কোন মূল্য নেই। সেটা বরং কু-শিক্ষা বলতে হবে। সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে তার ঈমান-আকীদা সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ছুটিতে তাকে তাবলীগে কিংবা আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবাতে ও সাহচর্যে পাঠানো পিতা-

মাতার উপর ফরজ। অনুরূপভাবে সে যেন নাস্তিক না হয়ে যায় এবং দ্বীনের সহীহ বুঝ যেন বাকি থাকে সেজন্য যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য অপরিহার্য।

মুফতী আব্দুল কুদ্দুস নামে হযরত থানবী (রহ) এর এক মুরীদের পুত্রের মুখে আমি শুনেছি , তিনি হারদুঈ এর মসজিদে এক বয়ানে বলেছিলেন-তার পিতা অর্থাৎ হযরত থানবী (রহ) এর সেই মুরীদ একবার তার শাইখ এর নিকট চিঠি লিখলেন যে, হযরত! আমার দুটি ছেলে- তার মধ্যে একজনকে মাদ্রাসায় দিয়েছি দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য, আরেক জনকে স্কুলে দিয়েছি ইংরেজী শিক্ষার জন্য। হযরত থানবী (রহ) জবাবে লিখলেন, যে ছেলেকে ইংরেজী শেখার জন্য স্কুলে দিয়েছ তার ঈমানের হেফাজতের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছ? ঐ মুরীদ আমাদের মত কেউ হলে হয়ত উত্তর দিত যে, তার জন্য একজন মৌলভী ঠিক করেছি। তিনি প্রতিদিন বাসায় এসে এক সময় কুরআন শরীফ পড়িয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু ঐ মুরীদ জানতেন যে, এই জবাবে হযরত থানবী (রহ) কে সন্তুষ্ট করা যাবেনা। তাই তিনি ঐ ছেলেকেও ইংরেজী শিক্ষা থেকে বের করে মাদরাসায় ভর্তি করে আল্লাহর কালাম শিক্ষার কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং একথা লিখে হযরতকে জানিয়ে দিলেন। হযরত উত্তর দিলেন যে, খুবই ভাল কাজ করেছ।

৪। চার নম্বর হক হল, ছেলে-মেয়ে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে দেখে শুনে কোন দ্বীনদার পাত্র/পাত্রীর সাথে বিবাহ দিয়ে দেয়া। (মিশকাত-২/২৬৭)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হলে যা করণীয়

বর্তমান মূর্খতার যামানায় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি হলেই গালি-গালাজ, মারধর এমনকি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ঘটনা পর্যন্ত ঘটে থাকে। এটা মারাত্মক মূর্খতা। এরূপ ক্ষেত্রে সবর-ধৈর্য, নসীহত এবং সংশোধনের রাস্তা অবলম্বন করাই শরীআতের নির্দেশ। জায়িয কাজ গুলির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল তালাক। (মিশকাত-২/২৮৩)

আমাদের সমাজে যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাতো মা-বাপ, স্ত্রী-

সন্তানের হক সম্পর্কে কিছুই জানে না। বিবাহ করল আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে মেযাজের খেলাফ কিছু হয়ে গেলে দিয়ে দিল তিন তালাক। হারাম করে দিল স্ত্রীকে। পরে যখন মন-মেযাজ ঠিক হল তখন দিশেহারা হয়ে ভ্রান্ত মতবাদ পন্থীদের নিকট যেয়ে কয়েক 'শত টাকা ফি দিয়ে বিবাহ হালাল করে নিয়ে এল, আর ফতোয়া শোনাল যে, রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না অথবা মুখের কথায় তালাক হয় না। অথচ শরঈ মাসআলা হচ্ছে, রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক পড়ে যায় এবং মুখের কথায় তালাক পড়ে যায়। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম- ৯/৯৪, ফতোয়ায়ে শামী-২/৪৬৩)

তারা আরো বলে যে, এক সাথে তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হয় ইত্যাদি। অথচ শরীআতের মাসআলা হচ্ছে, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। (এলাউস সুনান-১১/৭৯, বুখারী-২/৭৯১)

এ ধরনের ভুল ফতোয়ার মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সারা জীবন যিনার পথ খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং তালাকের পথে না গিয়ে সংশোধনের পথ অবলম্বন করতে হবে। মেযাজের খেলাফ শরীআত বিরোধী কোন কাজ যদি স্ত্রী করে ফেলে তাহলে

(ক) প্রথমতঃ নসীহতের মাধ্যমে তাকে বুঝাতে হবে। আর ছোটখাট সমস্ত ভুল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা হিকমতের কারণে তাদেরকে আকল বুদ্ধি কিছুটা কম দিয়েছেন। তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের সাথে ক্ষমা সুলভ আচরণ করতে হবে।

(খ) নসীহতেও যদি কাজ না হয় তাহলে একই ঘরে রেখে বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।

(গ) এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কাজ না হলে তাকে এমন ভাবে হালকা শাস্তি প্রদান করতে হবে, যাতে শরীরের কোথাও যখম বা দাগ না হয়। এটা জায়িয হওয়া সত্ত্বেও কোন নবী (আঃ) এটা করেন নাই। প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা স্ত্রীকে মার-ধোর করবে না। সুতরাং নিজেকে ভদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য সাধানুযায়ী এ থেকে বেঁচে থাকা চাই।

(ঘ) এতেও যদি কোন কাজ না হয় তাহলে উভয় পক্ষের মুরব্বীদের দ্বারা সালিশ বসাতে হবে। সালিশের মাধ্যমে এসব বিষয়ের মিমাংসা করাতে হবে।

এতেও যদি কোন কাজ না হয় অর্থাৎ এই চার স্তর অতিক্রম করার পরেও যদি কোন ফায়েদা না হয় তাহলে খুব ধীরে সুস্থে , ভেবে চিন্তে মুফতীদের নিকট থেকে ফতওয়া গ্রহণ করে মাত্র এক তালাক দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই তিন তালাক দেবে না। কেননা, শরীআত এমন কোন প্রয়োজন রাখেনি যে ক্ষেত্রে তিন তালাক দেয়া জরুরী। আর এই এক তালাক দিতে হবে স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরে তার সাথে মিলিত না হয়েই। এক তালাক দিলে এক তালাক পতিত হবে। এই অবস্থায় স্ত্রী যদি নিজেকে সংশোধন করে নেয় এবং স্ত্রী কর্তব্যও তাই, তাহলে তিন হায়েয শেষ হওয়ার পূর্বে বিবহা দোহরানো ছাড়াই এবং হিলা করা ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক ভাবে বা স্বামী সুলভ আচরণের মাধ্যমে স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

আর যদি বনিবনা না হয় তাহলে এক তালাক দেয়ার পরে তিন হায়েয পার হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে উক্ত মহিলা যেখানে ইচ্ছা বিবাহ বসতে পারবে। তাই স্ত্রীকে বিবাহ থেকে বের করার জন্য তিন তালাক দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এক সাথে তিন তালাক দেয়া হারাম করা হয়েছে। অবশ্য কেউ দিলে সবগুলীই পড়ে স্ত্রী সম্পূর্ণ রুপে হারাম হয়ে যাবে।

তালাকের ব্যাপারে শরীআতের মাসআলা সম্মন্ধে চরম অজ্ঞতা আমাদেরকে একটা বিভ্রান্তীর মধ্যে ফেলে রেখেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে যে তালাকের আইন প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ শরীআত বিরোধী। রেডিও, টি ভিতে এবং ইংরেজদের মদদপুষ্ট এনজিওরা এভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না। মুখের কথায় তালাক হয় না। তালাক দেয়ার সাথে সাথে তা কার্যকর হয়না, বরং ৯০ দিন পার হওয়ার পরে চেয়ারম্যান সাহেব তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে না পারলে তা কার্যকর হবে। অথচ শরীআতের মাসআলা হচ্ছে, তালাক হাসি- মুখে দিক বা রাগান্বিত অবস্থায় দিক সর্বাবস্থায় তা পতিত হবে। এবং মৌখিক দিক বা লিখিত দিক তা কার্যকর হবে। আর তালাক দেয়ার সাথে সাথেই তা কার্যকারী হয়ে যাবে। ৯০ দিনের কোন শর্ত নেই। সুতরাং নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হলে টি ভির ফতওয়া মত না চলে আল্লাহ ওয়ালা হক্কানী মুফতীদের ফতওয়া মত চলতে হবে।

স্ত্রীদের জন্য উপদেশ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী বেশী দান সদকা কর। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখীদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা অধিক। মহিলারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন, অধিক পরিমাণে লা'নত করে থাক আর স্বামীর না-শোকরী কর। তোমাদের জ্ঞান এবং দ্বীন অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একজন বিচক্ষণ মানুষের আকল তোমাদের চেয়ে অধিক বিলুপ্তকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। মহিলারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদের জ্ঞান ও দ্বীন অসম্পূর্ণ কিভাবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, তোমাদের স্বাক্ষ্যর মান পুরুষের অর্ধেক নয় কি? তারা বলল, নিশ্চয়। নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা হল তোমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। তারপরে ইরশাদ করলেন, একথা কি সত্য নয় যে, হায়েয অবস্থায় তোমরা নামায পড় না এবং রোযাও রাখ না? তারা বলল, নিশ্চয়। নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা হল তোমাদের দ্বীনের অসম্পূর্ণতা।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী সমাজের পাঁচটি ত্রুটির কথা আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে অনিচ্ছাধীন এবং তিনটি হচ্ছে ইচ্ছাধীন। অনিচ্ছাধীন দুটি হল জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দ্বীনের অসম্পূর্ণতা। আর ইচ্ছাধীন তিনটি হল, স্বামীর না- শোকরী করা, অনর্থক লা'নত ও অভিশাপ এবং বদ দু'আ করা আর ভুল তথ্য দিয়ে বিচক্ষণ পুরুষের আকল বিলুপ্ত করে দেয়া। অনিচ্ছাধীন যে ত্রুটিগুলি রয়েছে সেগুলির বর্ণনা এজন্য করেছেন, যাতে মহিলাদের গর্ব ও অহংকারের রোগটি দূর হয়ে যায়। কেননা, গর্ব-অহংকার সাধারণতঃ জ্ঞানের স্বল্পতা থেকে সৃষ্টি হয়।

যাদের অন্তরে মহান রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব পয়দা হয়ে গেছে তারা নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে করে। যে ব্যক্তি রুস্তম পাহলোয়ানের শক্তি আর দানবীর হাতেম তাইয়ের দানের কথা স্মরণ করবে, সে কখনো নিজেকে

শক্তিশালী আর দানশীল ভাবতে পারে না। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইলম আর প্রজ্ঞা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে কখনো নিজকে বড় আলেম ভাবতে পারেব না। আজকাল তো অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সামান্য বুযুর্গী অর্জন করতে পারলে নিজেকে অনেক কিছু ভেবে বসে। বিশেষ করে মহিলাদের তেলাওয়াতের পাবন্দ হলেই বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারলেই নিজেকে রাবেয়া বসরী মনে করে বসে। আর অন্যকে ছোট মনে করে। এর কারণ এটাই যে, তাদেরকে কেউ তরবিয়াত করে না।

অবশিষ্ট তিনটি ইচ্ছাধীন ত্রুটি মহিলাদের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সংশোধন করা সম্ভব। তার মধ্যে একটা হল, অধিক লা‘নত করা। অর্থাৎ কথায় কথায় কাউকে লা‘নত বা ভর্ৎসনা করা। তাদেরকে দেখা যায় সকাল থেকে সন্ধা যা পর্যন্ত এই কাজেই কেটে যায়। যার সাথে শত্রুতা আছে তার গীবত আর নিন্দাবাদ করতে করতে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। আর যার সাথে মহব্বত আছে তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। এমনকি নিজের সন্তানরাও যদি বিরক্ত করে বা সংসারের মাল সামানা নষ্ট করে তখন অনেক মহিলা মারাত্মক ধরনের অভিশাপ বা বদ দু‘আ দিয়ে বসে, যা কবুল হয়ে সেই বিপদ ঘটে গেলে আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের ঈমানই নষ্ট করে ফেলে।

নারীদের দ্বিতীয় দোষ হচ্ছে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা। তাদেরকে যতকিছুই এনে দেয়া হোক, তা তাদের নিকট অল্প কম্‌দামী ও নিকৃষ্ট মনে হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দেহলবী (রহ) বলতেন, স্ত্রীদের যত দামী কাপড় থাকুক- যখন তুমি জিজ্ঞাসা করবে তোমাপ কাপড় চোপড় কিছু আছে? তখন উত্তরে বলবে- হাঁ, কয়েকটা বস্তা আছে। কোথাও পরে যাওয়ার মত না। আর জুতা যতই থাকুক, যদি জিজ্ঞাসা কর- তাহলে উত্তরে বলবে, হাঁ কয়েক জোড়া খড়ম আছে। এসব কথা স্বামীর মারাত্বক নাশোকরী। এ ধরনের কথা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

মোট কথা লেবাস-পোশাক, অলংকারাদী, তৈজসপত্র, বাড়ী-ঘর সবকিছুতেই তারা অপচয় করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদী, প্রথা-প্রচলন আর এমন কিছু রুসুমও তারা পালন করে যা

শিরক ও বিদ‘আতের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া অহংকার, বড়ত্ব প্রকাশ। আর লোক দেখানো স্বভাব ইত্যাদি কোনটা থেকেই তারা মুক্ত নয়। তাই এসব রুসুম রেওয়াজ থেকে তাওবা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্রা স্ত্রীগণের অনুসরণ এবং পায়রবী করা প্রতিটি নারীর একান্ত কর্তব্য।

নারীদের তৃতীয় দোষ হচ্ছে বিচক্ষণ পুরুষের আকল বিলুপ্ত করে দেয়া। অনেক সময় দেখা যায়, মহিলারা এমন সব অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলে যে, একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী পুরুষও বোকা বনে যায়। তাদের কথার মধ্যে এমন প্রভাব আর যাদুময়তা থাকে যে, এমনিতেই পুরুষরা তাদের বশ হয়ে যায়। তার কারণ অবশ্য এটা নয় যে, তারা পুরুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানী। বরং চাতুর্যতা আর ছলনায় তারা পুরুষ থেকে অগ্রগামী। জ্ঞান-গরীমা এক জিনিষ আর ছল-চাতুরী আরেক জিনিষ। মোটকথা, এই ছল-চাতুরী আর চালাকীর কারণেই নারী একজন বিচক্ষণ মানুষের বিচক্ষণতা নষ্ট করে দেয়। অনেক মহিলা নির্জনে স্বামীর সাথে এমন কায়দা-কৌশলে কথা-বার্তা বলে যাতে স্বামী সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার সর্বপ্রথম ও প্রধান চেষ্টা হয় স্বামীকে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছন্ন করা। যে মা এত কষ্ট করে, এত ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে কলিজাসম সন্তানকে প্রতিপালন করলেন-আজ তাদের প্রাপ্য হল সন্তান পৃথক হয়ে যাওয়া। এটা কত বড় জুলুমের কথা!! (আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অপকর্ম থেকে হেফাজত করুন) এখানেই শেষ নয় বরং স্বামীর উপার্জিত অর্থ যেন পিতা-মাতার নিকট না যায় সে জন্যও তার চেষ্টার কোন শেষ থাকেনা। স্বামীর ভাই-বোন কিংবা পুর্বের ঘরের সন্তান থাকলে তাদের থেকেও স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। মোটকথা, তার দিন-রাতের ফিকির একটাই থাকে যে, আমি ছাড়া আর কারো সাথে যেন আমার স্বামী সম্পর্ক না থাকে। এর ফলে সমাজের বহু ফ্যামিলিতে, বহু অনৈক্য-বিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে।

পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে, ছেলেদের বিবাহ দেয়ার পরে কিছুদিন নিজেদের সাথে রেখে তাকে গড়ে তোলার জন্য এবং সাংসারিক জীবনে পারদর্শী করে তোলার জন্য তাকে পৃথক কয়ে দেয়া। যৌথ সংসারের

বেপর্দেগী থেকে বাঁচানোর জন্য, ভাইদের আপোষ মিল-মহব্বত বজায় রাখার জন্য এবং এধরনের আরো বহুবিধ উপকারের জন্য ছেলেকে পৃথক করে দিয়ে পিছন থেকে তাকে গাইড করা। এটাই শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। অপর দিকে পৃথক হয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য কর্তব্য হচ্ছে, পিতা-মাতার খবর রাখা, তাদের খিদমত করা এবং সময়ে সময়ে হাদিয়া তোহফা পেশ করা। পিতা-মাতা নিজ দায়িত্বে এগুলি করবেন। স্ত্রী জন্য স্বামীকে ভুল তথ্য দিয়ে এগুলি করানো মারাত্মক অপরাধ।

নারী জাতির উল্লেখিত তিনটি দোষই এমন, যা সকল অন্যায়-অপকর্মের ভিত্তি। যেমন, অকৃতজ্ঞতা এবং স্বামীকে বেকুফ বানানোর মূলে রয়েছে লোভ-লালসা। অধিক লা'নত থেকে সৃষ্টি হয় অনৈক্য, ঝগড়া-বিবাদ, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং এই তিনটি মন্দ স্বভাবের সংশোধন করা একান্ত জরুরী। আর সংশোধনের পথ হল ইলম ও আমলের সমন্বয়। ইলমের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে। কেননা, নামায-রোযা শিক্ষার পাশাপাশি আখলাক-চরিত্র সংশোধন করাও জরুরী। আখলাক-চরিত্র সংশোধন না করলে ইবাদত-বন্দেগী কোন কাজে আসবে না।

একটি হাদীসে বর্ণিত আছে : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আরয করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! অমুক মহিলা খুব ইবাদত করে, রাত্রি জাগরণ করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার কি হুকুম?) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর অন্য এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সে ইবাদত বন্দেগী খুব বেশী একটা করতে পারে না কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে জান্নাতী।

সুতরাং ইলম হাসিল করার জন্য হযরত থানবী (রহ) রচিত বেহেশতী জেওর পুরাটাই পড়ে নেবে। তবে তোতা পাখির মত পড়ে গেলে কোন কাজ হবে না। বরং স্বামী যদি আলেম হয় তাহলে এক এক সবক করে তার নিকট পড়ে নিবে। আর স্বামী যদি আলেম না হয় তাহলে তাকে অনুরোধ করবে সে যেন কোন আলেমের নিকট থেকে বুঝে এসে এক সবক করে পড়িয়ে দেয়। আবার একবার পড়ে বন্ধ করে রেখে দিলেও চলবে না। বরং

একটা সময় নির্ধারণ করে সর্বদা একা একা পড়তে হবে এবং অন্যকেও শোনাতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি কেউ এ পদ্ধতি গ্রহণ করে তাহলে তার অবশ্যই সংশোধন হবে।

সংশোধনের আমলী পদ্ধতি হল, জরুরী কথা ব্যতিত মুখ বন্ধ রাখা। কেউ ভাল বলুক বা মন্দ বলুক কোন অবস্থাতেই কথা না বলা। এতে করে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা, জ্ঞানীর জ্ঞান বিলুপ্ত করা, লা'নত-অভিশাপ, গীবত-পরনিন্দা ইত্যাদি অধিকাংশ কু-অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। কেননা, যখন প্রয়োজনীয় কথার বাইরে মুখ বন্ধ করে রাখা হবে তখন এ সকল রোগের আকাংখা দুর্বল আর নিস্ক্রীয় হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ একটা সময় নির্ধারণ করে নিয়ে তখন বসে বসে ভাববে যে, এই দুনিয়া আর কদিনের! একদিন তো এখান থেকে চলে যেতেই হবে। মৃত্যু এবং পরবর্তী বিষয় যথা, কবর, মুনকার-নকীরের প্রশ্ন, তার পরে কবর থেকে ওঠা এবং হিসাব-কিতাব, পুলসিরাত অতিক্রম করা ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে প্রতিদিন কিছু সময় গভীরভাবে চিন্তা করবে। এর ফলে দুনিয়া প্রীতি, ধন-সম্পদের মোহ, অহংকার, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মার রোগ সমূহ দূর হয়ে যাবে। আর এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ জারী রাখাও উচিত।

ভুল প্রথা সংশোধনে বর পক্ষের করণীয়

১) প্রচলিত বর যাত্রার ব্যবস্থা না করা।

২) প্রথাগত অনেক লোককে বরযাত্রী হিসেবে না নেয়া।

৩) মেয়ে পক্ষের দাওয়াতী মেহমানের সংখ্যার চেয়ে বেশী লোক না যাওয়া।

৪) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কন্যার জন্য যৌতুক না পাঠানো।

৫) গায়ের মাহরামাদেরকে সাথে নিয়ে কনের ইযন বা অনুমতি আনতে না যাওয়া।

৬) গায়ের মাহরাম তথা পর পুরুষদেরকে কনের মুখ না দেখানো।

৭) গান-বাজনা, ভি ডিও, ভি সি আর তথা অবৈধ আনন্দের ব্যবস্থা না করা।

৮) সালামী গ্রহণ না করা।

৯) মোহরানা সম্পর্কে পূর্বেই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা, যাতে বিবাহের সময় তা নিয়ে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত না হতে হয়।

১০) লোক দেখানো এবং গর্বের জন্য অলীমা না করা। বরং শুধু সুন্নাত হিসাবে নিজের সামর্থের মধ্যে থেকে অলীমা করা এবং তাতে মহিলাদের আগমনের ব্যবস্থা না করা।

১১) খেদমতের প্রতিদানের নামে কনে পক্ষের লোকদের নিকট থেকে কর্মচারী বা খাদেরমদের জন্য বখশীশ দাবী না করা।

১২) মোহরানার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া এবং মোহরানা আদায়ে গাফিলতী না করা।

১৩) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কর্মকান্ড না করা, যা কন্যা পক্ষের অস্থীরতার কারণ হয়, আর নিজেদের সুনাম প্রকাশ পায়।

১৪) বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার কারণে যেন ফরজ-ওয়াজিবসহ শরঈ হুকুম-আহকামের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অনীহাভাব প্রকাশ না পায়।

ভুল প্রথা সংশোধণ কন্যা পক্ষের করণীয়

১) কনের গায়ে হলুদের নামে যুবক-যুবতীদের বেপর্দেগীর কোন সুযোগ না দেয়া।

২) বর যাত্রী আগমনের আবেদন না করা।

৩) ছেলের জন্য যৌতুক-উপঢৌকন প্রেরণ না করা, প্রেরণ করাকে অপছন্দ করা।

৪) নির্ধারিত স্থানে প্রকাশ্যে কনের পোষাক পরিবর্তন না করা।

৫) এলাকা বাসীদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না করা।

৬) বিবাহের সাজ-সরঞ্জাম, অলংকারাদী প্রকাশ্যে অন্যদেরকে না দেখানো।

৭) বিবাহের পরে অপ্রয়োজনে বরকে শরবত পান করানোর প্রথা পালন না করা।

৮) খেদমতের প্রতিদানের নামে ছেলে পক্ষের লোকদের নিকট থেকে কর্মচারী এবং খাদেমদের জন্য পুরস্কার দাবী না করা।

৯) গায়ের মাহরাম মহিলাদের বরের সামনে কক্ষনো না আসা।

১০) সালামী গ্রহণ না করা এবং এটাকে জরুরী মনে না করা।

১১) নাম যশের জন্য বিভিন্ন প্রথা পালন না করা। যেমন লাইটিং করা, গেট সাজানো, গান-বাজনার আসর জমানো।

১২) ব্যস্ততার কারণে ফরজ-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন না থাকা। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে হযরত থানবী (রহ.) রচিত ইসলাহুর রুসূম নামক কিতাব দ্রষ্টব্য।

বিবাহের কতিপয় বদ রুসূম

মেয়ের ইযিন আনার জন্য ছেলেপক্ষ স্বাক্ষি পাঠিয়ে থাকে, শরিআতের এর কোন প্রয়োজন নেই।

বিবাহের সময় অনেকে বর- কনের দ্বারা তিনবার করে ইজাব কবূল পাঠ করিয়ে থাকেন এবং পরে তাদের দ্বারা আমীন বলান। শরীআত এর কোন ভিত্তি নেই।

খেজুর ছিটানো

হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর বিবাহ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজলিসে খেজুর ছিটিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসীনগণ জঈফ বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং একে সুন্নতে যায়িদা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু শরীআতের বিধান হল, কোন মুস্তাহাব বা মুবাহ কাজের ক্ষেত্রে যদি ফাসাদ দেখা দেয় তাহলে তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। খেজুর ছিটানোর দ্বারা যেহেতু অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেমন অনেকের চশমা ভেঙ্গে যায়, ধাক্কা ধাক্কী হয়, মসজিদে এধরনের ঘটনা ঘটলে মসজিদেরও বে-হুরমতী হয়, তাই উত্তম হল খেজুর না ছিটিয়ে হাতে হাতে বন্টন করে দেয়া। তাছাড়া সুন্নত শুধুমাত্র খুরমা খেজুরের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কিসমিস বা যে কোন মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যাদী বিতরণ করলেও এই সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

গান-বাজনা ও আতশবাজী

বিবাহ উপলক্ষে এখন গান বাজনা, ভি ডি ও, ভি সি আর ইত্যাদি মহামারী আকার ধারন করেছে। আর কোন কোন এলাকায় তো যুবতী- তরুণী মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ গানও করে থাকে। শরীআতের দৃষ্টিতে এগুলি সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়িয। এধরনের বিবাহে কোন বরকত হয় না। বিবাহের মত সাওয়াবের কাজ গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন জাতির মধ্যে বেহায়াপনা যখন এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, তারা প্রকশ্যেই নির্লজ্জ কাজ করতে শুরু করবে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ-মহামারীসহ এমন রোগ ছড়িয়ে পড়বে যার নাম পূর্বে কখনো শোনা যায়নি। গান বাজনার মত আতশবাজী পোড়ানো, পটকা ইত্যাদি ফোটানোও কিন্তু গোনাহের কাজ। এতে অনর্থক ছাড়াও জান মালের ক্ষয়ক্ষতিসহ আরো বিভিন্ন রকমের খারাবী রয়েছে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি তোলা ও ভি ডি ও করা

আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠান মানেই গোনাহের ছড়া ছড়ি। এমন এমন গোনাহ সেখানে সংঘটিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি তোলা ও ভিডিও করা। ছবি না তুললে বিবাহের অনুষ্ঠান যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : " কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাব হবে ছবি অংকনকারীদের" । শরীআতের দৃষ্টিতে কোন প্রাণীর ছবি তোলা চাই তা ক্যামেরার মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও বা ভিসি আরের মাধ্যমে হোক বা অংকন করা হোক, সবই হারাম। সুতরাং এসব হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

বিবাহ শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার

১. অনেক জায়গায় বিবাহে রওয়ানা হওয়ার আগে এলাকার প্রসিদ্ধ মাযার যিয়ারত করে তার পরে রওয়ানা হয়, শরীআতে এর কোন ভিত্তি নেই।

২. বরের নিকট কনে পক্ষের লোকেরা হাত ধোয়ানোর টাকা, পান পাত্রে পানের সাথে টাকা দিয়ে তার থেকে কয়েকগুণ বেশী টাকা জোর জবরদস্তী করে আদায় করে থাকে। এভাবে জোর করে টাকা আদায় করা জায়িয নাই।
৩. অনেক জায়গায় গেট সাজিয়ে সেখানে বরকে আটকে দেয়া হয় এবং টাকা না দেয়া পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটাও একটা গর্হিত কাজ। কেননা, বর হচ্ছে মেহমান আর মেহমানের যথোপযুক্ত মেহমানদারী করা ঈমানের আলামত। সেই মেহমান থেকে এভাবে জোরপূর্বক টাকা আদায় করা নাজায়িয।
৪. খাওয়া দাওয়া শেষ কনে পক্ষের লোকেরা বরের হাত ধোয়ায়। পরে হাত ধোয়ানো বাবদ তারা টাকা দাবী করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এটা একেবারেই অনুচিৎ। মূলতঃ এসবই হিন্দুয়ানী প্রথা। দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের সাথে বসবাস করার কারণে আমাদের মধ্যে এই কুসংস্কারগুলি অনুপ্রবেশ করেছে। বর পক্ষের লোকেরা তো মেহমান। মেহমানের কাছ থেকে এভাবে চাপ দিয়ে টাকা উসূল করা কি ভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে?
৫. বিবাহ পড়ানোর আগে বা পরে যৌতুকের বিভিন্ন জিনিষ- পত্র প্রকাশ্য মজলিসে সকলের উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটাও অন্যায় ও নির্লজ্জতার কাজ। কারণ একেতো যৌতুক নেয়া-দেয়া নাজায়িয, তারপরে সেই নাজায়িয কাজের আবার প্রদর্শনী!!
৬. বিবাহের পরে নারী-পুরুষ সকলের সামনে কনের পিতা জামাই- মেয়ের হাত একসাথে করে তাদেরকে দু'আ দেয়। কনের পিতা জামাইকে বলে আমার মেয়েকে তোমার হাতে সোপে দিলাম। তুমি একে দেখে শুনে রেখ। এধরনের আরো কিছু কথা বলে। এর কোন ভিত্তি শরীআতে নেই। কেননা, জামাইকে কিছু নসীহত করতে হলে, তাকে যে কোন এক সময় বলা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে মাহরাম-গায়রে মাহরাম সকলের সামনে উভয়ের হাত এভাবে একসাথে করা বেপর্দা ও নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছু নয়।
৭. বিবাহ করে আনার পরে শ্বশুর বাড়ীতে বনবধূকে বিভিন্ন কায়দায় বরণ করা হয়। কোথাও ধান, দুবলা ঘাস, দুধের স্বর ইত্যাদি দিয়ে বরণ

করা হয় এবং নববধূর চেহারা সকলকে দেখানো হয়; এসবই হিন্দুয়ানী প্রথা। কোন মুসলমানের জন্য এসব করা জায়িয নেই।

৮. অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ের আগের দিন আর কোথাও মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যায়ার পরের দিন মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে মাছ- মিষ্টি ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে। কোথাও এটাকে চৌথি বলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজায়িয প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়।

৯. বর বা কনেকে কোলে করে গাড়ী বা পালকী থেকে নামিয়ে ঘরে তোলাও চরম অভদ্রতা বৈ কিছু নয়।

১০. ঈদের সময় মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে চাল আটা ময়দা পিঠা ইত্যাদি পাঠানো এবং এ প্রচলনকে জরুরী মনে করার প্রথা অনেক জায়গায় আছে। আবার অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিক ভাবে জামাইকে এবং তার ভাই-বোনদেরকে কাপড় চোপড় দেয়ার প্রথা আছে। এমনকি এটাকে এতটাই জরুরী মনে করা হয় যে, ঋণ করে হলেও তা দিতে হয়। এটা শরীআতের সীমালংঘন ছাড়া আর কিছু নয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানে মহিলাদের সমাগম

কয়েকজন মহিলা দ্বীনী তা'লীমের মজলিস ছাড়া অন্য কোথাও একত্রিত হলে সেখানে গোনাহের কাজ যে হবেই এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এজন্য মহিলাদেরকে কোন অনুষ্ঠানে যেতে হযরত থানবী (রহঃ) নিষেধ করেছেন। শুধুমাত্র শরঈ কোন প্রয়োজনে একত্রিত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে মহিলারা যেন সাজসজ্জা না করে সাধারণ কাজ কামের পোশাক পরে তাতে শরীক হয়। আর স্বামী বা কোন মাহরাম যেন তাদের সাথে থাকে। মহিলাদেরকে একাকী ছেড়ে দেয়া কখনো উচিত নয়। বর্তমানের বিবাহের মজলিস গুলিতে মহিলারা যেভাবে সাজ সজ্জা করে, অলংকারাদী পরে এবং নিজেকে বিকশিত করে উপস্থিত হয় তাতে একথা বুঝতে কারো অসুবিধা থাকে না যে, এখানে দাওয়াত রক্ষার তুলনায় নিজের প্রদর্শনিই মুখ্য উদ্দেশ্য। এধরনের বেপর্দা আর বেহায়াপনার কারণে উক্ত মজলিসে উপস্থিত নারী পুরুষ সকলেই গোনাহগার হয়।

নতুন দুলার মুখ দর্শন

বিবাহের পরে মেয়েকে উঠিয়ে দেয়ার আগ মূহুর্তে মেয়ের বাড়ীতে পাড়া-প্রতিবেশীর মেয়েরা একত্রিত হয় আর বরকে অন্দর মহলে এনে সকলে মিলে হৈ হল্লা করে তার মুখ দর্শন করে। মেয়েরা হাসি মজাক করে বিভিন্ন উপায়ে নতুন দুলাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। আর নির্লজ্জ হাসি তামাশায় মেতে ওঠে। এধরনের বেপর্দেগী শরীআতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

নব বধূর মুখ দর্শন

অনেক জায়াগায় প্রথা আছে যে, নববধূকে পালকী বা গাড়ী থেকে নামিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। তাপরে উপস্থিত মহল্লাবাসীর সামনে নববধূর মুখ খুলে দেখান হয়। এরূপ দেখা ও দেখানো হারাম এবং নাজায়িয। কোথাও আবার রেওয়াজ আছে যে, নববধূকে একটা ঘরে বসানো হয়। অতঃপর সর্বপ্রথম শাশুড়ী কিংবা বাড়ীর বয়স্কা মহিলা তার মুখ দর্শন করে এবং কিছু দর্শনী দিয়ে থাকে। এভাবে একের পরে এক দেখতে থাকে এবং কিছু দিতে থাকে। এই দর্শনীকে এমনই জরুরী মনে করা হয় যে, কারো হাতে টাকা পয়সা না থাকলে তার জন্য আর বধূর মুখ দেখা হয়ে ওঠেনা। এটা সুস্পষ্টরূপে শরী‘আতের লংঘন।

এসব প্রথা ও কুসংস্কার বন্ধ করার পদ্ধতি

বিবাহ শাদী উপলক্ষে আমাদের সমাজে যেসব রুসূম রেওয়াজ পালিত হচ্ছে সে সব বন্ধ করার জন্য সকলকেই উদ্যোগী হওয়া দরকার। খান্দানের বা সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যদি বসে এভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা কোন হক্কানী আলেমকে দাওয়াত করে বিবাহের সুন্নাত তরীকার বয়ান শুনব, অতঃপর তিনি সুন্নাত তরীকায় বিবাহ পড়িয়ে দেবেন, তারপরে খুরমা বন্টন হবে, ব্যস শেষ। এখন থেকে আমাদের এলাকার বিবাহ-শাদীতে আমরা শরীআত বিরোধী কোন কাজ করব না-তাহলে অতি সহজেই এই প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের দেখাদেখি আশে পাশের লোকেরাও এটা বর্জন করতে শুরু করবে। এভাবে সমাজ থেকে এসব

কুপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যারা মোটামুটি দ্বীনদার তারা যদি দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধানন্ত নিয়ে নেন যে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহে আমরা শরীআত বিরোধী কোন আচার-অনুষ্ঠান করব না এবং যেখানে এধরনের অনুষ্ঠান হবে সেখানে যাবও না। তাহলে অতি সহজেই এসব বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

যদি প্রত্যেক মুসলমান এই প্রত্যয় করে নেয় যে, আমার জীবনের সকল কাজ আমি শরীআতের হুকুম অনুযায়ী সম্পাদন করব এবং আলেম উলামাদের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া কেনা কাজ করব না। তাহলেও বিভিন্ন ধরনের শরীআত বিরোধী কাজ সমাজ থেকে উঠে যাবে বলে আমরা আশা করি। তাই আসুন আমরা আজ থেকেই দৃঢ় ভাবে ইরাদা করে নেই যে, কুরআন-হাদীস বিরোধী কোন কাজ আমি নিজেও করব না এবং যেখানে এধরনের কাজ হয় সেখানে অংশও নেব না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

স্ত্রীর হক বা স্বামীর কর্তব্যের আরো কিছু বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেনঃ من لبا س لكم وانتم لبا س لهن

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের (স্বামীদের) পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সূরা বাক্বারা-১৮)

আল্লাহ তা'আলা এ ধরায় মানব জাতি তথা নারী-পুরুষের মাঝে এক বিষ্ময়কর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। বানিয়েছেন একজনকে আরেক জনের পরিপূরক। ঘোষণা দিয়েছেন অন্যজনের লেবাস তুল্য বলে। পোশাক যেমন মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে লোক সমাজে তাকে সুন্দর আকৃতিতে প্রকাশ করে এবং পরিহিত ব্যক্তির দোষত্রুটি গোপন রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, অন্যদের নিকট একে অন্যের সততা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্বের কীর্তন করে। আভ্যন্তরীণ অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির অবগতির পরও তা প্রকাশ করে না, গোপনীয়তা রক্ষা করে।

দু'সদস্য বিশিষ্ট স্বামী-স্ত্রীর সার্বক্ষণিকের জীবনে মনোমালিন্য, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ পর্যায়ে স্বামীকে ধৈর্য্য ধারণের মাধ্যমে একথাই প্রমাণ করতে হবে যে, আমাকে যে স্ত্রী দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই দেয়া হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতী বন্টন। সুতরাং এর উপর আমার সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বস্তুতে তুষ্টির বে-নযীর দৃষ্টান্ত

হযরত হাসান বসরী (রহ.) একজন গোলাম খরিদ করছিলেন। সে গোলাম একজন আল্লাহ ওয়ালা এবং বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে গোলাম! তোমার নাম কি?

গোলাম বলল, “হুযুর! গোলামের কোন নাম থাকেনা। মালিক যে নামে ডাকে সেটাই তার নাম।

চিন্তা করে দেখুন, এ আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ গোলাম হযরত হাসান বসরীর (রহ.) মত তাবে'ঈকে-যিনি একশত বিশজনের অধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন -পর্যন্ত গোলমীর আদব শিক্ষা দিচ্ছেন। অতপর হযরত হাসান বসরী (রহ.) তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি কী খেতে পছন্দ করো?

সে উত্তরে বললো, হুযুর! গোলামের কোন স্বতন্ত্র পছন্দ নেই, মনিব যা খেতে দেন তাই তার পছন্দ।

পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার প্রিয় পোশাক কোনটি?

ভৃত্য জবাবে বলল, গোলামের কোন লেবাস হয় না। মালিক যা পরতে দেন তাই তার পোশাক।

এদতশ্রবণের হযরত হাসান বসরী (রহ.) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অতপর যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি বললেন, হে গোলাম! আমি তোমাকে শৃংখল মুক্ত করে দিলাম, আজ হতে তুমি গোলাম নও, তুমি আযাদ, মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি। গোলাম বলল, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তবে আপনার নিকট আমার প্রশ্ন-আপনি আমাকে কোন্

খুশিতে আযাদ করে দিলেন? প্রত্তুরে হাসান বসরী (রহ.) বলেন, “তুমি আমাকে আল্লাহর গোলামী শিখিয়েছো; এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা খেতে দেন খুশীর সাথে তাই খেতে হয়, আল্লাহ যা পরতে দেন খুশীর সাথে তাই পরতে হয়, তেমনি ভাবে যে স্ত্রী প্রদান করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর এটাই আল্লাহর পরিপূর্ণ গোলামী।
এ ঘটনা আমাদেরকে একথাই শিক্ষা দেয় যে, যে সহধর্মিনী আমাদেরকে দান করা হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই দান করা হয়েছে। আমার জন্য এর চেয়ে ভাল আর কেউ হতে পারেনা। কারণ আমার মাওলার কুদরতী বন্টনের মাধ্যমেই আমি তাকে পেয়েছি। সুতরাং এই বিবির প্রতিই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাদেরকে নসীহত করতে হবে। তারা আক্কলের দরুণ ভূল-ভ্রান্তি করে বসলে যথা সম্ভব তাকে মাফ করে দিতে হবে। তাদের আচার-আচরণকে যথ সম্ভব বরদাশত করে নিয়ে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রয়োজনের মুহাব্বাতের সাথে তাদের বুঝাতে হবে, নসীহত করতে হবে, দ্বীনী কিতাবের তা'লীম দিতে হবে। তাকদেরকে মোটেও হেয় নযরে দেখা যাবেনা। তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবেনা। যেহেতু তারা বেহেশতের হুরদের চেয়েও অধিক সম্মানী, সৌন্দর্যের অধিকারী এবং সুন্দরী হবে। কেননা স্ত্রীলোকেরা দুনিয়াতে নামায পড়েছে, রোযা পালন করেছে, স্বামীর খিদমত করে তাকে সন্তুষ্ট রেখেছে, পর্দা করেছে। পক্ষান্তরে হুররা সেসব ইবাদত করেনি। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের নূর ও জ্যোতি দুনিয়ার স্ত্রীদের চেহারায় দান করবেন। খোদা প্রদত্ত সেই নূরের বদৌলতে জান্নাতে দুনিয়ার সেই স্ত্রীরা বেহেশতী হুরদের অপেক্ষা অধিক সুন্দরী পরিদৃষ্ট হবে।
সুতরাং নিজ পত্নীদেরকে হেয় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবেনা। মাত্র কয়েক দিনের জন্য তারা তোমাদের সাথী হয়ে আছে। অসংখ্য খিদমদের আঞ্জাম দিচ্ছে, তাদের খিদমতের ফিরিস্তি অনেক লম্বা। সামান্য চিন্তা করলেই তা বুঝা সম্ভব। তাদের উছিলায় পুরুষ অনেক গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছে, সন্তানের চেহারা দেখছে, নিশ্চিন্ত ভাবে দ্বীন-দুনিয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হচ্ছে ইত্যাদি। অপর দিকে বিশেষ হিকমতের কারণে তাদেরকে পুরুষদের তুলনায় কম আকল দেয়া হয়েছে-একারণে তারা অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে বসে, এটা ক্ষমা যোগ্য। তাদের জান্নাতী মর্যাদা

লক্ষ্য করে তাদের বক্রতাপূর্ণ আচরণ সহ্য করলে শুধু প্রভু তুষ্টি এবং দাম্পত্য জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবেনা বরং সবরের কারণে ইনশাআল্লাহ আল্লাহওয়ালাদের কাতারে শামিল হওয়া যাবে। ইসলামী ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক লোকের প্রমাণ পাওয়া যায়, যারা স্বীয় স্ত্রীর বক্রতাপূর্ণ আচার-ব্যবহারে সহনশীলতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় প্রদানের ফলে তারা ওলীদের মর্যদার ভূষিত হয়েছে। এরূপ মহান ব্যক্তিদের থেকে কয়েক জনের ঘটনা একটু বিস্তারিত তুলে ধরলাম, যারা স্ত্রীদের বদৌলতে ওলী হয়েছেন।

ঘটনা-১ : হযরত শাহ আবুল হাসান খারকানীর (রহ.) স্ত্রী বড়ই বদ মেযাজী ছিল। শাহ সাহেবের নিকট জনৈক খোরাসানী ব্যক্তি বাই'আতের জন্য তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-হযরত কোথায় আছেন? অন্দর মহল হতে বিবি সাহেবা উত্তরে বললেন-কিসের হযরত? আমি রাত-দিন তার নিকটই আছি। তার মধ্যে বুযুর্গীর কি আছে? এ উত্তর শুনে খোরাসানী বেচারা কাঁদতে লাগল। প্রতিবেশীদের সাথে আফসোস প্রকাশার্তে বলল-হাজার মাইল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে আসলাম বাই'আতের জন্য। আর বিবি সাহেবা বলছেন, তিনি বুযুর্গই নন। লোকেরা তার কথা শুনে বলল, বিবি সাহেবার কথায় কর্ণপাত করো না। বরং তুমি ময়দানে যাও এবং তার আমল-আখলাক ও কারামত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করো।

অতপর সে ব্যক্তি মাঠে গিয়ে শাহ সাহেবকে বাঘের পিঠে আরোহী অবস্থায় আসতে দেখলো। এদিকে শাহ সাহেব ব্যাপারটি আঁচ করতে পারলেন যে, এ খোরাসানী ঘর থেকে আমার স্ত্রীর কটুক্তি শুনে এসেছে। তাই বুযুর্গ তাকে সম্বোধন করে বললেন- এ বদমেযাজ স্ত্রীর বদমেযাজ ও তিক্ততা আমি সহ্য করছি যার ফলশ্রুতিতে এ হিংস্র বাঘ আমার গোলামী খাটছে। আল্লাহ তা'আলা এ স্ত্রীর বদৌলতে আমাকে এ নে'আমত প্রদান করেছেন। আমি বিবিকে আল্লাহর বান্দী মনে করে আল্লাহ তা'আলার বন্টনে খুশি হয়ে কালাতিপাত করছি। আমি যদি তাকে তালাক প্রদান করি তাহলে সে আমার অন্য মুসলমান ভাইকে কষ্ট দিবে। এজন্য তাকে আল্লাহর বান্দী ধারণাপূর্বক আল্লাহর বন্টনে খুশি হয়ে কার্য সম্পাদন করি। আমি তাকে স্ত্রীর চেয়ে আল্লাহর বান্দী এবং তারই কুদরতী বন্টন হিসাবে প্রাধান্য দান পূর্বক তার সাথে সৌজন্যে মূলক আচরণ করি। তার তিক্ত ব্যবহারকে খুশি মনে

করে বরদশ্‌ত করি।
অতপর শাহ আবুল হাসান খারকানী (রহ.) আল্লামা রুমীর (রহ.) একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার অর্থঃ "আমার ধৈর্য্য যদি এ মহিলার কষ্ট-যাতনাকে সহ্য না করত, তাহলে এ হিংস্র বাঘ কি আমার বেগার খাটতো যে, আমি তার পিঠে বসে আছি? আবার ওর পিঠে লাকড়ির বোঝা চাপিয়েছি? এসব কারামত আল্লাহ তা'আলা এ মহিলার তিক্ত স্বভাবের সহ্য করার কারণেই দিয়েছেন।
ঘটনা-২: এ ঘটনা মির্যা মাযহার জানে জাঁনা (রহ.) এর। একদা এক বুযুর্গের ইলহাম হলো যে, হে মির্যা মাযহার জানে জাঁনে! দিল্লিতে এমন এক মহিলা আছে, যে নামাযের পাবন্দ এবং কুরআনে কারীমের খুব তিলাওয়াত কারী, কিন্তু সে খুব জেদী ও বদমেযাজ। তাকে বিয়ে করে নাও। কেননা, তোমার স্বভাব প্রকৃতি খুব নাজুক এবং স্পর্শকাতর। বাদশাহ তোমার খিদমত করতে যেয়ে পান করার পেয়ালা বাঁকা করে রাখাতে তোমার মাথায় ব্যাথা ধরে যায়, কাথার বা লেপের সুতা বাঁকা থাকলে তোমার মাথায় দরদ হয়ে যায়, ঘুমাতে পার না। দিল্লির জামে মসজিদে যাওয়ার প্রাক্কালে চারপায়ী বা চৌকী বক্র অবস্থায় দেখলে তোমার মাথা ধরে যায়, যখন তোমার স্বভাব এত নাজুক, তাই সে নাজুকতা এবং স্পর্শকাতরতা দূর করার জন্য চিকিৎসা স্বরূপ তুমি সেই মহিলাকে বিয়ে করে নাও। আমি তোমাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবো। তোমার বিজয় ডংকা সারা দুনিয়াতে বেজে উঠবে। অতপর হযরত মির্যা জানে জাঁনা (রহ.) তাকে বিয়ে করে নিয়ে আসলেন এবং নিজের নাজুকতার এলাজ স্বরূপ সকাল-সন্ধ্যা তার তিক্ততা সহ্য করতে লাগলেন।
একদিন এক কাবুলী হযরতের খানা আনার জন্য হযরতের বাড়ীতে গিয়ে বলল, হযরতের খানা দিন। ভিতর থেকে স্ত্রী কন্ঠ বেজে উঠল- কিসের হযরত হযরত করছো? এগুলো তোমার হযরত কে খুব শোনাও গিয়ে। পাঠান এরূপ উত্তরে রাগান্বিত হয়ে অবস্থার হাল ক্রিয়ায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুরি বের করে মারতে উদ্যত হল, সহসা তার চেতনা ফিরে এলে সে বলল, আপনি আমার শাইখের বিবি না হলে এখন ছুরি মেরে কারবার শেষ করে দিতাম। অতপর সে ব্যক্তি হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা (রহ.) এর নিকট গিয়ে বলল! হযরত আপনি কেমন

বদমেযাজ মহিলা বিয়ে করেছেন? তিনি বললেন, এ স্ত্রীর উপর ধৈর্য ধারণ করার বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। ওলীদের কাতারে শামিল করেছেন। এবং আমার বিজয় ও সুনামের ডংকা সারা এলাকায় বাজিয়ে দিয়েছেন।

শাহ গোলাম আলী সাহেব (রহ.) মির্যা মাযহার জানে জাঁনা (রহ.) এর খলীফা ছিলেন। মাওলানা খালেদ কুর্দী (রহ.) ও তাঁর খলীফা ছিলেন। এ উভয়েই হযরতের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। মোটকথা : আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় স্ত্রীর বক্রতা ও তিক্ত স্বভাব সহ্য করার বদৌলতে প্রথম সারির ওলীগণের অন্তর্ভূক্ত করেন। (মানাযিলে সুলুক, ২৫-২৯)

কয়েকটি সতর্কতা যা সুখ-শান্তির জন্য অপরিহার্য

স্বামীকে যাতে অবাঞ্ছিত অবস্থার সম্মুখীন না হতে হয়, সেজন্য কিছু পূর্ব পালনীয় বিষয় তুলে ধরছি এবং সাথে সাথে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপর আরোপিত কতিপয় অধিকারের বর্ণনা প্রদান করা হল।

যে কোন খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ নয়

কিছু লোক ইউরোপ হতে এমন মেয়ে বিয়ে করে আনে যে, বাহ্যিক ভাবে সে খৃষ্টান হলেও আসলে সে নাস্তিক। সুতরাং তাকে কুরআনে বর্ণিত আহলে কিতাব মনে করা ভুল। তাই জেনে রাখা দরকার যে, এধরনের মেয়েদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে কখনও বৈধ হতে পারেনা। কিছু লোকতো কার্যতঃ খৃষ্টান নারীই বিয়ে করে আনে কিন্তু খৃষ্টান নারী সংস্পর্শে সে নিজেই ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। এধরনের বিয়ে হতে বেচে থাকা অপরিহার্য। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত-২:১১৪)

প্রকৃত ইয়াহুদ-খৃষ্টান মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.) দেখলেন যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগীরী সহ অনেক রকম খারাবীতে লিপ্ত তাই তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করলেন। (মা'আরেফুল কুরআন ৩/৬৪)

স্ত্রীকে মহরানা মাফ করতে বলা আত্মমর্যাদার খিলাফ

স্ত্রীকে মহরানা মাফ করে দেয়ার কথা বলা স্বামীর আত্মমর্যাদার পরিপন্থি। এছাড়া লাঞ্চনা-গঞ্জনাতো আছেই। তবে স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে নিজের পক্ষ থেকে তা মাফ করে দেয়, তাহেল মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু খুশি মনে মাফ করে দিলো কি-না এটা বুঝা কঠিন ব্যাপার। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন-মহরের টাকা/সম্পদ তাদের হাতে দেয়ার পর যদি তারা সবটা বা কিয়দাংশ স্বামীকে ফেরৎ দেয়, তাহলে আর কোন সন্দেহ থাকেনা, এটাই উত্তম পন্থা। খুশি মনে মাফ করার পরোয়া না করে যদি স্ত্রী থেকে মৌখিক মাফের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে অথবা এমন কোন বিষয়ের উপর জোর যবরদস্তি করে, যার দ্বারা সে মাফ করতে বাধ্য হয়, তাহলে খুব ভালভাবে স্মরণ রেখ! এ ধরনের মাফ আল্লাহ তা'আলার নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য হবেনা। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত ২:১৩৪)

মহরানা আদায় করাই স্বামীর জন্য শ্রেয়

স্ত্রী যদি মহরানা মাফ করে দেয়, তথাপি স্বামীর আত্মসম্মানের দাবী এটাই যে, সে স্ত্রী মহরানা যথা শীঘ্রই আদায় করে দিবে। (আশরাফুস সাওয়ানেহ, ৩:২০৪)

একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে এবং সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করে না এবং ইনসাফ করে না, কিয়ামত দিবসে সে অর্ধাঙ্গবস্থায় উঠবে। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠে আসত, তিনি তাঁকে নিয়ে সফরে যেতেন। (মিশকাতঃ ১০৯, ইসলামে ইনকিলাবে উম্মত)

স্ত্রীকে ভিন্ন ঘর বা কামরা দেওয়া ওয়াজিব

স্ত্রী যদি পৃথক থাকতে চায় তাহলে অন্যদের সাথে তাকে একত্রে রাখা জায়িজ নাই। বরং তার থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা জরুরী। যেখানে স্বামীর অন্য কোন লোক থাকবে না। তবে এতটুকু করতে পারে যে, যদি আলাদ ঘর দিতে নাও পারে তাহলে অন্ততঃ তার জন্য আলাদা একটি রুম দিবে। যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হয়। সে কামরায় যেন সে তার আসবাবপত্র নির্দ্বিধায় সংরক্ষণ করতে পারে।স্বাধীন ভাবে স্বামীর সাথে একান্তে উঠা-বসা এবং কথা-বার্তা বলতে পারে। ওয়াজিব আদায়ের জন্য এতটুকু যথেষ্ট। দোজাহানের বাদশাহ হযরত নবী কারীম (সাঃ) উম্মুল মুমিনীনদের অবস্থানের জন্য যে হুজরা প্রদান করেছিলেন তার দৈর্ঘ ছিল প্রায় দশ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৬/৭ হাত। (আসাহহুস সিয়ার)

স্বামীর আপনজন হতে স্ত্রীকে পৃথক রাখাই নিরাপদ

এ যুগের মানুষদের একে অন্যের হক সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাদের মন-মেযাজ ও তার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে শরী'আতের দাবী এটাই যে, স্ত্রী যদি স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে একত্রে থাকতে চায়, আর আত্মীয়-স্বজনরাও স্ত্রীর ভিন্ন থাকতে অসন্তুষ্ট হয় তথাপি স্ত্রীকে ভিন্ন রাখাই কল্যাণকর ও নিরাপদ, তাতে হাজারো অনিষ্টের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এতে যদি দু'চারদিন আত্মীয়-স্বজনদের কটুকথাও শুনতে হয় এবং নাক-মুখ খিচুনী দেখতে হয় তথাপি এর কল্যাণকর দিক যখন তারা অবলোকন করবে তখন তারা খুশী হয়ে যাবে। বিশেষ করে চুলাতো আলাদা হওয়াই উচিৎ। কেননা অধিকাংশ সময় ঝগড়ায় আগুন এ চুলা থেকেই প্রজ্বলিত হয়। ফকীহগণ তো এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, স্বামীর যদি প্রথম ঘরের কোন সন্তান থাকে তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাদের সাথে রাখার জন্য বাধ্য করা যাবে না। অথচ আজকাল বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, অপর স্ত্রীর সন্তান সাথে রাখতে গিয়ে এমন অনেক বড় ফাসাদ সৃষ্টি হয় যে, অন্যান্য আপন জনের থেকেও তত বড় ফাসাদ বা জটিলতা সৃষ্টি হয়না। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ) এ বিষয়টিকে অত্যান্ত গুরত্ব সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

স্ত্রীর সাথে হাস্য-রসিকতা করাও সুন্নাত

হযরত আয়িশা (রহঃ) যেহেতু বয়সে সকলের ছোট ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়স অনুপাতে তাঁর সাথে হাস্য-রসিকতাও করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আয়িশার (রাঃ) সাথে দৌড় প্রতিযোগীতা করলেন। হযরত আয়িশার (রাঃ) বয়স কম হওয়ার কারণে তাঁর শরীর হালকা-পাতলা ছিল। তাই তিনি দৌড়ে রাসূলের আগে চলে গেলেন। অনেকদিন পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার হযরত আয়িশার (রাঃ) দৌড়ে অবতীর্ণ হলেন। ততদিনে হযরত আয়িশার (রাঃ) শরীর ভারী হয়ে গেছে। কেনন মেয়েদের শরীর খুব তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যায়। তাদের গঠন দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করে। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগে চলে গেলেন। তখন নবী (আঃ) তাঁকে বললেন-এটা সেবারের বদলা। সুবাহানাল্লাহ! কোথাও পাওয়া যাবে নবী চরিত্রের এই অনুপম দৃষ্টান্ত? এছাড়াও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিবিদেরকে খুশী করার জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতেন। যার মধ্যে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় থাকত। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়িশাকে এগারজন বিবির কাহিনী শুনিয়েছিলেন। (হাদীস নং-(৫০৮২)

স্ত্রীর সাথে সৎব্যবহারের ফযীলত

হযরত আয়িশা (রাঃ) : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ভাল বলে বিবেচিত হয় সেই মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট ভাল পুরুষ। আর আমি হচ্ছি আমার পরিজনের পক্ষে ভাল। যখন তোমাদের কোন সাথী মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তার দুর্নাম করো না।
(মিশকাতর শরীফ)

হযরত আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন, যার স্বভাব-ব্যবহার ভাল এবং যে তার পরিজনের উপর দয়ালু। (বেহেশতি জেওর-২০৪পৃষ্ঠা)

স্ত্রীদের তা'লীমের সংক্ষিপ্ত রীতি-নীতি

(১) বিয়ে করে আনার পর সর্বপ্রথম স্ত্রীকে অন্তরঙ্গ করে নিবে। এরপর প্রয়োজনীয় ঈমান-আকীদার পরীক্ষা নিবে এবং বেহেশতী জেওর প্রথম খন্ডে ঈমান-আকীদার যে সমস্ত কথা আছে সেগুলো তাকে শুনিয়ে পড়ে প্রশ্ন করবে তুমি কি এগুলো ঠিক মনে কর? সে যদি হ্যাঁ বলে তাহলে তার সম্মতিকেই যথেষ্ট মনে করবে। তার মুখ থেকে আকীদাগুলোর বিস্তারিত শুনার প্রয়োজন নেই। কেননা লোকদের এব্যাপারে জবরদস্তি করা ঠিক নয়। আর যদি কোন আকীদার ব্যাপারে সে সংশয় প্রকাশ করে, সেটা তাকে খুব ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলবে যে, এই ব্যাপারে এই আকীদা রাখা আবশ্যক। সুতরাং এর অনূকুল বিশ্বাস থাকা চাই। নতুবা ঈমানের জন্য অনেক বড় ক্ষতির আশংকা আছে।

(২) তার নামাযের পূর্ণ বিবরণ শুনবে। নামাযে কি কি পড়তে হয় কোন নামায কত রাকাত, ফরয কত রাকাত, ওয়াজিব কত রাকাত, সুন্নাত কত রাকাত। প্রত্যেক নামাযের নিয়ত কিভাবে করতে হয়, রুকু সেজদা বৈঠকের অবস্থা সবকিছু প্রশ্ন করে দেখবে, তাতে কোন ভূ-ভ্রান্তি আছে কি-না। যদি থাকে তাহলে তা শুধরিয়ে দিবে। শুধরিয়ে দেয়ার অর্থ একবার শুধু মুখে বলে দেয়া নয়, কেননা তার ভুলে যাওয়ারও তো সম্ভবনা রয়েছে। অথবা অনেক গুলো ভূল একসাথে শুধরিয়ে দেয়ার ফলে সবগুলো একসাথে মনে রাখতে না পারার সম্ভবনা রয়েছে। তাই একেকটা ভুলের সংশোধনের পর বার বার মশক করিয়ে নিবে। এভাবে তার নামাযের সবদিক গুলো ঠিক করে দিবে।

(৩) পর্দার সকল আহকাম ও মাসায়িল বেহেশতি জেওরে রয়েছে, সে গুলো দেখে দেখে তাকে বলে দিবে।

(৪) তার সাথে কার কি হক, বিশেষ করে যাদের সাথে অহরহ উঠা-বসা করছে তাদের প্রতি তার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিবে। হুকুকুল ইসলাম পুস্তিকায় এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। সেটা তাকে পড়ে শুনাবে অথবা সে নিজে পড়ে বুঝে নিবে।

(৫) প্রচলিত কুসংস্কার সমূহের অনিষ্টতা তার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিবে। সে গুলো তার অন্তরে এরূপ বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে দিবে যেন সে এসবের কাছেও না ঘেষে। ইসলাহুর রুসূম কিতাব খানি এজন্য যথেষ্ট। এছাড়া অন্যান্য আমল-আখলাক ও স্বভাব-আচরণের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তার সহজ পদ্ধতি নিম্ন বর্ণিত কিতাবগুলো অল্প অল্প করে তাকে পড়ে শুনানো। যথা : সম্পূর্ণ বেহেশতী জেওর, ফুরূউল ঈমান, জাযাউল আমাল, তালীমুদ্দীন, সাফাইয়ে মু'আমালাত, হুকুকুল ইসলাম, আদাবুল মু'আশারাত, কসদুস সাবীল, তাবলীগে দ্বীন ইত্যাদি। যদি কখন এসব কিতাবের বর্ণিত বিষয়ের বিপরীত কোন কিছু তার ভিতর দেখা যায়, তাহলে মাঝে-মধ্যে নরম ভাষায় তা তাকে বুঝায়ে দিবে। বার বার বলতে গিয়ে তাকে বিরক্ত করবেনা। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সুফল দেখা দিবে। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন - وذكرفان الذ كر ى تنفع المو منين

অর্থাৎ "তাদেরকে বুঝাতে থাক। কেননা বুঝানোর দ্বারা ঈমানদার লোকদের ফায়দা হয়।" (সুরাহ যারিয়াহঃ ৫৫)

(৬) খরচ করার ব্যাপারে তাকে এ শিক্ষা দিবে যে, সে যেন অপব্যয় ও অপচয় না করে এবং প্রয়োজন অনুপাতে হিসাব করে খরচ করে।

(৭) অলংকার এবং পোশাক-পরিচ্ছদে যেন বিলাসিতা না করে, সে জন্য এগুলোর ব্যাপারে তার মনে ঘৃণা জন্মাবে।

(৮) কছদুস ছাবীল থেকে তাকে কিছু যিকির ও দু'আ কিতাব থেকে প্রয়োজনীয় দু'আ তাকে শিখিয়ে দিবে। আর যদি সুন্নাতের অনুসারী কোন মুহাক্কিক শাইখের সন্ধান পাওয়া যায়- অনুসন্ধান করলে কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে- তাহলে সে বুযুর্গের গুণ-গান তার সামনে গাইতে থাকবে। এক পর্যায়ে যখন তার অন্তরে উক্ত বুযুর্গের ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন নিজ ইন্তিযামে তাকে সেই বুযুর্গের মুরীদ করে নিবে। এর দ্বারা আনুগত্যের ব্যাপারটি আরো সহজ হয়ে যাবে।

(৯) কিছু সময় অবসর করে নিয়ে যদি তাকে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে নেওয়া যায়, যার দ্বারা নিজে নিজে উল্লেখিত কিতাবাদী পড়ে বুঝে নিতে পারে, তাহলে সেটা তার জন্য অত্যাধিক উপকারী হবে। সাথে সাথে দীন সম্পর্কে তার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে।

(১০) প্রত্যেক স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলে রাখবে যে, তার দ্বারা যদি এমন কাজ প্রকাশ পায় যা শরীয়তের বা সুন্নাতের খেলাপ তাহলে স্ত্রী যেন স্বামীকে অবশ্যই সতর্ক করে দেয়। এবং স্ত্রীকে ভালভাবে আশ্বস্ত করবে যে, স্বামী মোটেও অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং খুশী হবেন কারণ এটাই আসল কল্যাণ কামনা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্ত্রী-পুত্র সহ সকলের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমীন

সন্তানদের শিক্ষাদান পদ্ধতি

সন্তানদের সর্ব পথম যথা সম্ভব সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ শিখাবে। কুরআনে কারীম সহীহ শুদ্ধ ও চালু হওয়ার আগে বিষয়ের বোঝা শিশুর উপর চাপাবে না। একসাথে কয়েকটি বিষয় পড়তে দিলে তার কুরআন তিলাওয়াত সুন্দর হবেনা। তারপর সহজ-সরল ভাষায় লেখা দ্বীনী কিতাবাদী এভাবে নির্বাচন করে পড়াবে, যাতে দীনের সকল অংশের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। এর জন্য বেহেশতী জেওর দশ খন্ড যথেষ্ট। যদি ঘরের পুরুষ লোক পড়ায়, তাহলে মেয়েদের সামনে আলোচনা করতে লজ্জা হয় এরূপ আলোচনা এড়িয়ে পড়াবে এবং নিজের স্ত্রী মাধ্যমে পরে তা তাদেরকে বুঝিয়ে দিবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে মাসআলাগুলো প্রত্যেকের কিতাবে চিহ্নিত করে দিবে। বড় হয়ে তারা সেগুলো নিজেরা বুঝে নিবে। যদি কারো ভাগ্য আলেম স্বামী জুটে যায়, তাহলে স্বীয় স্বামী হতে বুঝে নিবে। আর যদি স্বীয় স্বামী যদি আলেম না হয়, তাহলে সে স্বামীর মাধ্যমে কোন আলিম থেকে তা বুঝে নিবে। (বেহেশতি জেওর -২৭২)

মুসিলম জাতির সাফল্য কোন পথে

সুরায়ে হুজুরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّـهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে এবং পরিচয়ের জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি। তবে তোমাদের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াওয়ালা হবে, সে-ই আল্লাহ তা‘আলার নিকট অধিক সম্মানী হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং খবর রাখেন। (আয়াত ১৩)”

তাফসীর

“প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে।” মানুষ সৃষ্টির মধ্যে পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রী সমান দখল। কাজেই কেউ কারো থেকে বেনিয়ায বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেককে প্রত্যেককের দিকে মুহতাজ করে দিয়েছেন এবং উভয়ের সম্মিলনে একটি পরিপূর্ণ আকৃতি দান করেছেন। সুতরাং পুরুষের গর্ব করার কিছু নেই। মহিলাদেরও গর্ব করার কিছু নেই। প্রত্যেককে আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেকের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর ইরশাদ হচ্ছেঃ এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। এক একজনের গোত্রের বা বংশের নাম একেক রকম- এটা আল্লাহ তা‘আলা করে দিয়েছেন কেন? আল্লাহ পাক বলছেন-

“যাতে করে একটা পরিচিতি লাভ হয়, একজন আরেক জনকে সহজে চিনতে পারে।” এর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি হবেনা বা আল্লাহর দরবারে কারো মাকবূলিয়াত হয়ে যাবে না যে, আমি কুরাইশ খান্দানের লোক, অমুক সায়্যিদ বংশের লোক, অমুক মঈনুদ্দিন চিশতির বংশের লোক-এজন্য কোন সম্মান লাভ হয়ে যাবে না, এজন্য বংশের এ বিভক্তি নয়। এটা শুধু মাত্র তোমাদের পরিচয়ের সুবিধার্থে। আল্লাহর দরবারে এই খান্দানী নাম-কাম যেটা দুনিয়াতে আছে, এটার কোন মূল্য নেই। এই কারণে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বলেছিলেনঃ ”হে ফাতেমা!“ তুমি নিজেকে নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। অর্থাৎ তুমি নবীর মেয়ে এই ভরসায় বসে থেকো না।”

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রত্যেকে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবং আখিরাত সুন্দর করার জন্য ফিকির রাখতে হবে, নিজের চেষ্টা থাকতে হবে। আমি অমূক খান্দানের লোক-এর দ্বারা পার হয়ে যাবো বা আল্লাহর দরবারে বিরাট মর্তবা হবে, এ ধারণা ইসলামে অমূলক। যার আমল আছে সেই আল্লাহর দরবারে প্রিয় বা প্রিয়া হবে। চাই তার দুনিয়াতে কোন নাম করা বংশ থাকুক চাই না থাকুক। আর যার আমল নাই, তার দাদা বহু কিছু ছিল বা তার বাবা বহু কিছু ছিল এতে তার কোন ফায়দা হবে না। তার পিতার মর্তবা যে, তিনি দীনের জন্য কুরবানী করেছেন? আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন, এর দ্বারা ছেলের কি হল বা মেয়ের কি হল? তাদের তো কিছুই হবেনা। হ্যাঁ! তারাও যদি অনুরূপ মেহনত করে কুরবানী করে তাহলে আল্লাহকে পেতে পারে, কুরআন হাদীসের ইল্‌ম শিখতে পারে, দ্বীনের কথা প্রচার করতে পারে তাহলে তাদেরও সম্মান বাড়বে।

তাই সামনের অংশে আল্লাহ পাক বলছেন "আল্লাহর দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই বেশী সম্মানী হবে, দামী হবে যে, বেশী তাক্বাওয়া ওয়ালা। অর্থাৎ যার দিলের ভিতর আল্লাহর ভয় বেশী আছে, যে আল্লাহর হুকুম মুতাবিক নিজে চলে, নিজের অধীনস্থদের চালায় এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে তাকেই বলে তাক্বাওযা ওয়ালা, তাকেই বলে মুত্তাকী। সেই আল্লাহর দরবারে বেশী সম্মানী। যে যতটুকু মুত্তাকী হতে পারবে, আল্লাহর দরবারে তার ততটুকু মর্যাদা ও সম্মানে থাকবে। এটাই সমস্ত সম্মানের বুনিয়াদ, সমস্ত উন্নতি ও আখিরাতের তরক্কীর চাবি-কাঠি।

আসল জিনিষ হচ্ছে এ তাক্‌ওয়া বা আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি করা। এটা সাধারণতঃ নেক লোকের সোহবত ও তাদের বয়ান দ্বারা আসে। বুযুর্গানে দ্বীনের দ্বীনী আলোচনা শুনলে, মাশায়িখগণের দিলের ভিতর যে ইলম ও মা'রেফাত আছে, খোদার মহব্বত আছে, রাসূলের(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশক আছে, তাদের বয়ান যখন কেউ শুনে, আল্লাহ তা'আলা ইখারের মত সেই বুযুর্গদের আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত মহব্বত ও মা'রেফাত ঐ বয়ান শ্রবণকারীদের অন্তরে পৌঁছে দেন। বই পড়ে ইলম হাসিল করা যায় কিন্তু আমলে পূর্ণ অভ্যস্তি আসেনা। আমলে অভ্যস্ত হওয়া যায় আল্লাহ ওয়ালাদের বয়ান ও সাহচর্য দ্বারা। এরজন্য হাদীসে পাওয়া যায় মহিলা সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট

আবেদন করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা পর্দার কারণে সরাসরি আপনার মজলিসে বসতে পারিনা। তাই আমাদের আপনার বয়ানে উপকৃত হওয়ার একটা সুরত করে দিন। তাদের এ প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতনে যে, তাদের ভিতরে দ্বীন আসতে হলে এভাবে কিছু হক্কানী কথা, সহীহ লোকদের কথা শুনা দরকার। এ জন্য রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মহিলা সাহাবীগণের জন্য একটা বিশেষ দিন ঠিক করেছিলেন এবং একটা স্থান ঠিক করেছিলেন, বলেছিলেন ,অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা জমায়েত হবে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান পেশ করবো। এভাবে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি উম্মতের মা-বোনদের জন্য এরূপ খুসুসী এক মাজলিসের ভিতরে পর্দার ইহতিমাম করে দ্বীনী বয়ান পেশ করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)পর্দাহীন ভাবে সরাসরি কোন মহিলার সাথে কথা বলেননি বা কাউকে ইসলামে দীক্ষিত করেননি।

আজকাল অনেক ভন্ড পীরদের দেখা যায় যে, তারা পরিষ্কার বলে দেয় যে- "দেখ! আমি তোমাদের পিতা সমতুল্য, আমাদের সাথে তোমাদের কোন পর্দা লাগাবে না। এগুলো হলো ভন্ডামী-এরা যদি বাপ হতে পারে তাহলে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বাপের সমতুল্য ছিলেন না? তিনি তাহলে সারা জিন্দেগীতে কোন সরাসরি কোন মহিলাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন না বা সামনা সামনি কোন নসীহত করলেন না? বরং যত বার মহিলারা এসেছে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্দার আড়াল থেকে তাদের কে নসীহত করেছেন, দ্বীনের কথা বলেছেন।

সারকথা, বংশ মর্যাদা বা পিতা, নানা-এর সংশ্লিষ্ট যত সম্মান আছে, এগুলো দ্বারা আমাদের কোন লাভ হবেনা। আমাদের কাজ আমাদের-ই করতে হবে। এর দ্বারাই আমাদের আল্লাহর দরবারে নৈকট্য লাভ হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং খবর রাখেন।

বরকতের জন্য ভূমিকা স্বরূপ আয়াতটি পেশ করলাম। এখন কিছু জরুরী কথা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

আজকাল এক দুঃখজনক অবস্থা শুরু হয়েছে গেছে, অমুসলিমদের মদদপুষ্ট এন. জি. ও. দের কারণে আমাদের মা-বোনদের একাংশ রাস্তায় নেমে গেছে সমান অধিকার আদায়ের দাবীতে। কিন্তু তারা একথা চিন্তা করেনি যে, ইসলাম তাদেরকে এত অধিকার দিয়েছে যে, সেটা সমান অধিকার থেকেও অনেক বেশী। কাজেই এ আন্দোলনের অর্থ হলো-আল্লাহ তা'আলা তাদের কে যে অধিকার দিয়েছেন তার থেকে আরো নিচে নেমে আসা। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মা-বোনদেরকে কত সম্মানিত করেছেন তা কল্পনার উর্ধ্বে। এর আলোচনা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপারে।

আল্লাহ তা'আলা শরী'আত মা-বোনদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন। আর মানব রচিত যত মতবাদ আছে তারা বরং মা-বোনদের বাজারের পণ্য বানিয়েছে, ভোগের সামগ্রী বানিয়েছে। আল্লাহর শরী'আত নারীদেরকে এত ইজ্জত দিয়েছে যে, দেখতে গেলে দেখা যায় অনেক দিক দিযে আল্লাহ তাদেরকে পুরুষেরও উপর মর্তবা দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার উপর কার হক বা পাওনা বেশী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন-তোমার মায়ের। সেই সাহাবী আবার প্রশ্ন করলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এর পর কার? রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তোমায়ে মায়ের। সেই সাহাবী আবার প্রশ্ন করলেন-তারপর কার? রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন-তোমার মায়ের। সাহাবী চতুর্থবার প্রশ্ন করলেন- তোমার পিতার। এ রেওয়ায়েত এত স্পষ্ট যে, দুনিয়ার অধিকাংশ মহিলা কারো মা, কারো স্ত্রী হতে পারে কিন্তু মা-ও তো হবে। মা যখন হয়ে গেল, তো তাকে এত বড় সম্মান দেয়া হচ্ছে যে, বাপের থেকে তা তিনগুণ বেশী। সন্তানদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে যে, বাপের আরাম- আয়েশের দিকে যত খেয়াল রাখবে, তার চেয়ে তিনগুণ বেশী খেয়াল রাখবে মায়ের আরাম- আয়েশের দিকে। এরপর যে সকল মায়েরা বদদ্বীন এন. জি. ও. দের প্ররোচনায় সমান অধিকারের দাবী করেছেন তারা কত বড় আহমকিই না করছেন।

এছাড়া সূরা নিসায় বিভিন্ন আয়াত আছে। যেমন-একটা আয়াতের

মধ্যে আছে- (মীরাছ সম্পর্কে) পুরুষরা মেয়েদের নির্ধারিত অংশের দ্বিগুণ পাবে। পুরুষদের বেশী দেওয়া হলো কেন তা পরে আলোচনা করছি, কিন্তু এখন যা বলার বিষয় তা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে ছেলেদের অংশ মেয়ের অংশের দ্বিগুণ। এ কথার ভিতর একটা গুরুত্ব রয়ে গেছে যে, এখানে মা-বোনের অংশকে বুনিয়াদ বানানো হয়েছে। অর্থাৎ সেটা হলো আসল। সেটা নির্দিষ্ট। স্থির ভাবে সাব্যস্ত আছে যে তারা এত পাবে। আর পুরুষদেরটা তাদের দ্বিগুণ হবে। বুঝা গেল আল্লাহ-রাসূলের নিকট মা-বোনদের অধিকার একান্ত নিশ্চিত, যেন রেজিষ্ট্রিকৃত। পুরুষদেরটা যদিও তাদের ডাবল করে দেওয়া হয় তবুওতো সেটা পূর্ব নির্ধারিত নয়। যদি আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলতেন যে, "মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাবে, তাহলে ছেলেদেরটা নির্দিষ্ট হত। আর তার ভিত্তি করে মেয়েরা পেত। কিন্তু সেরকম বলা হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হলো যে, নারীর অংশ এতটা নিশ্চিত যা পুরুষদেরও নয়।

এখন কথা হলো অনেক জায়গায় পুরুষরা মেয়েদের প্রতি এমন অন্যায় আচরণ করে যা শরীয়'আত স্বীকৃত নয়, তাহলে এজন্য পুরুষই দায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলার বিধানের মধ্যে কোন ক্রুটি নেই, থাকতেও পারে না। বরঞ্চ কুরআন হাদীসের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই তারা এরূপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলাতো মা-বোনদের অধিকার নিশ্চিত করনার্থে একটি সুরাই নাযিল করলেন। "সুরায়ে নিসা (মহিলাদের বিশেষ আহকাম সম্পর্কিত সুরাহ)" নামে পবিত্র কুরআনে একটি সুরাহ রয়েছে। অথচ সুরা রিজাল (পুরুষদের বিশেষ আহকাম সম্পর্কিত সুরাহ) নামে কোন সুরাহ নাই। এখন যদি পুরুষরা কুরআন না শিখে, কুরআন শরীফে আল্লাহ পাক কি বললেন তা না জানে, আর এ না জানার কারণে মা-বোনের উপর জুলুম করে তাহলে সেটা তারই দোষ। শরী'আতের দোষ নয়।

শরী'আতের ইল্‌ম না থাকার কারণে মানুষ আজ বিপথগামী হচ্ছে। মা-বোনদের ঠকাচ্ছে। বাপ-ভাই সবাই মিলে মেয়ে-বোনকে কি ভাবে কম দেওয়া যায়, কি ভাবে না দিয়ে পারা যায় সে জন্য মিটিং ডাকে। এটা শরী'আতের পরিপন্থি কাজ। শরী'আত বলেছে, তাদের অংশ খুশি খুশি দিয়ে দাও। এমনকি যদি মুখে বলে-ভাই আমি অংশ চাইনা; তবুও তাকে মাহরূম করা চলবে না এবং তা জায়িযও হবে না। এটা লৌকিকতা হলো।

লিখিত দিয়ে দাও, দলীল করে দিয়ে দাও।
আমাদের সমাজে সাধারণতঃ বোনেরা ভাইদের থেকে এজন্য অংশ নিতে চায় না যে, তারা মনে করে বাপ মারা গেছে এখন যদি আমি অংশ নেই তাহলে আমি আর বাপের বাড়িতে এসে কোন আদর পাব না। আমার কোন ক্বদরও থাকবে না। আর বাস্তবেও অনেক মূর্খ ভাই এরূপ করেও থাকে। কিন্তু শরী'আত এ শিক্ষা দেয়নি। শরী'আত শিক্ষা দিয়েছে-ভাই পরিষ্কার বলবে যে দ্যাখ! তোমার অংশ নিয়ে যদি আমি তোমাকে আপ্যায়ন করি তাহলে আল্লাহর নিকটে আমার কোন সওয়াব হাসিল হলো না। গ্রাম দেশে বলে-কৈ মাছের তেল দিয়ে কৈ মাছ ভাজি। ভয়েরা বলা উচিৎ-বোন! তোমার অংশ তুমি নিয়ে নাও। তোমার ছেলে-মেয়ে আছে তাদের জন্য প্রয়োজন পড়বে। এরপরও ভাই হিসাবে আমি তোমার যে খিদমত করে আসছি তা আ-জীবন করে যাবো ইনশাআল্লাহ। আর এ খিদমত দ্বারা আল্লাহ আমাকে অনেক ইন'আম দিবেন। তোমার খিদমতে কারণে আল্লাহ আমার হায়াতে ও মালে বরকত দিবেন। (বুখারী শরীফ)
আল্লাহ পাক তদ্বীয় রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বারা পুরুষদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে পুরুষরা! তোমরা যদি চাও যে, তোমার হায়াত দারাজ হোক এবং তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি হোক, তাহলে তোমরা বোনদের খবরগীরি করো। খালাদের খবর গীরি কোন, ফুফুদের খবরগীরি করো। এটাই তো পুরুষদের ভাগ্য। এখন বোনের অংশ দ্বারা যদি ভাই তার খবরদারী করে তাহলে হাদীসের এই ওয়াদার প্রতিদান তারা পাবে না। তাদের হায়াত দারাজ হবে নিজের পকেটের সম্পদ দ্বারা বোনের খবরদারী করলে। নিজের পকেটের সম্পদ দ্বারা খালার খবরদারী করলে ফুফুর খবরদারী করলে। আমাদের সমাজে পুরুষদের মধ্যে দীনের সেই শিক্ষা ও আদর্শ নেই বলেই যত অনিয়ম হচ্ছে।
পূর্বে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তার জবাব দিচ্ছি। প্রশ্ন হলো আল্লাহ পাক পুরুষকে নারী দ্বিগুণ দিলেন কেন? অনেকে না বুঝে এ অভিযোগ এনে বলে- আল্লাহ পাক মেয়েদের উপর ইনসাফ করেনি। (নাউযুবিল্লাহ) একটু চিন্তা করলেই এর উত্তর বুঝে এসে যাবে।
উল্লেখিত ব্যবস্থার কারণ এই যে, আল্লাহ পাক শরী'আতে মা-বোনদের খরচের কোন জিম্মাদারী দেন নি। বিয়ের আগে যতদিন বাপের বাড়িতে

থাকে ততদিন তার খরচভার বাপের উপর। যখন বিয়ে হয়ে গেল, তখন খানা-পিনা, লেবাস-পোশাক সহ যাবতীয় খরচের ভার স্বামীর উপর ন্যস্ত হয়। স্বামী বৃদ্ধ হয়ে কর্মক্ষম হয়ে গেলে অথবা মারা গেলে তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানের উপর।

সাধারণতঃ আল্লাহ পাক মা-বোনদের উপর কোন খরচের দায়িত্ব দেননি। তাদের সমস্ত খরচের দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছেন। সব জিম্মাদারী পুরুষের কাঁধে দিয়ে এখন যদি বলা হয়, তোমাদের তো খরচের জিম্মাদারী নেই, তদুপরি তোমরা বাপ মারা গেলে ভাই যে অংশ পাবে তুমি তার অর্ধেক পাবে। মা মারা গেলে ভাই যে অংশ পাবে তুমি তার অর্ধেক পাবে। এদিকে স্বামী থেকে পাবে, মহরতো পাবেই।

এখন বলুন! এটা কি তাদের উপর করুণা নয়? তাদের শুধু পাবারই পালা। খরচের কোন জিম্মাদারী তো নাই। তারা বাপের থেকে পাচ্ছে, মায়ের থেকে পাচ্ছে, স্বামী থেকে পাচ্ছে, সন্তানের থেকে পাচ্ছে। সবগুলো একত্র করলে সম্পদের স্তুপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ খরচের কোনই জিম্মাদারী নাই। তারা এগুলো নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম মতো যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে। এগুলো জমা করে হজ্ব করতে পারে। দীনের মহৎ কাজে ব্যয় করতে পারে। মসজিদ মাদ্‌রাসায় দান করতে পারে। ছেলে-মেয়ে ভাই-বোনদের জন্য খরচ করতে পারে। গরীব-দুঃখীদের শিক্ষা সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এসবই তার একচ্ছত্র অধিকার। এখানে স্বামীকে হস্তক্ষেপের কোনই অধিকার দেওয়া হয়নি। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এগুলো খরচ করার অধিকার রাখে। তদুপরি পুরুষদের কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নারীদের কে ইজ্জতের সাথে রাখার জন্য। তাদের খানা-পিনার দায়িত্ব, লেবাস-পোষাকের দায়িত্ব, বাসস্থানের দায়িত্ব, এবং তাদেরকে দীন শিখানোর দায়িত্ব পুরুষের উপর দেয়া হয়েছে। কোন পুরুষ যদি স্ত্রীকে দীন না শিখায় তাহলে স্ত্রী একা দায়ী হবেনা পুরুষও দায়ী হবে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মা-বোনদের ইজ্জত ও অধিকার যথার্থ ভাবে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের ঈমানী কর্তব্য হচ্ছে, বদদ্বীনদের কথায় কর্ণপাত না করা এবং আল্লাহর বিধানের উপর খুশী থাকা।

পাঁচটি মৌলিক দায়িত্ব

হযরত থানবী (রহ.) বিভিন্ন কিতাবে লিখেছেন যে, কুরআন-হাদীস ঘাটলে দেখা যায়- আল্লাহ তা'আলা নারী হোক পুরুষ হোক তাদের যতগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন, এগুলো একত্র করলে মোট পাঁচ ধরনের হয়। সেগুলো পুরুষের জন্য যেমন জরুরী তেমনি মা-বোনদের উপরও জরুরী। এই পাঁচটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা সকল মুসলিম নর-নারীর উপর ফরযে আইন। এই পাঁচ বিষয় হাসিল করারই নাম পূর্ণাঙ্গ তাক্বাওয়া। আর তাক্বাওয়া হলো ইজ্জত সম্মানের চাবি-কাঠি। সেই পাঁচটি জিনিষ কি কি তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম বিষয়ঃ আক্বায়িদ বা ঈমান

এটা সব কিছুর বুনিয়াদ। এটা ছাড়া কোন আমল গ্রহণীয় নয় আকীদা যদি দুরস্ত না হয়, ঈমান যদি দুরস্ত না হয়, তাহলে সে দ্বীনের যা কিছু করুক, ইসলামের যা কিছু করুক, সব বেকার গণ্য হবে। যেমন-যদি কোন একটা সংখ্যাও না থাকে এবং লক্ষ লক্ষ শূন্য বসানো হয়, এ শূন্য কোন কাজে আসবে না। কিন্তু এ শূন্য যদি সংখ্যার ডান পাশে বসানো হয়, তার প্রত্যেকটি শূন্যের মান আছে। ঈমান এমন একটি বুনিয়াদী জিনিস যে, এটা থাকার পর মানুষ যা করবে-আল্লাহর দরবারে তার দাম মর্যাদা বাড়তে থাকবে। আল্লাহ পাক বলেন-"তোমরা যা ভাল করছ তাতে তোমাদের দরজা-মর্তবা বাড়তে থাকবে"। ঈমান দুরস্ত রাখা, ক্ষতি গ্রস্ত হতে না দেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা এত নাজুক বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আকীদা বিশ্বাসগুলো পেশ করেছেন; মুমিন থাকার জন্য সবগুলোর বিশ্বাস থাকা জরুরী। এর কোন একটাও যদি কেউ অবিশ্বাস করে, যেমন কেউ যদি বলে আমি সব গুলো বিশ্বাস করি, শুধু কবরের আযাবটা বিশ্বাস করি না, (নাউযুবিল্লাহ) অথবা যদি কেউ বলে যে, আমি পুলসিরাত বিশ্বাস করি না, আর সব বিশ্বাস করি, তাতেও সে কাফির গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যত আকীদার কথা বলেছেন, না দেখে বিশ্বাস করার কথা বলেছেন, এর সবগুলোর প্রতি ঈমান

রাখা জরুরী। কোন একটাকে অবিশ্বাস করলে বা সন্দেহ করলে, সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন-একজন লোক সত্তর বৎসর পর্যন্ত আকীদা সমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে আসল; সত্তর বৎসর পর সে কোন একটা আকীদা অবিশ্বাস করল বা এমন একটা কথা বলল, যার দ্বারা তার ঈমানই চলে যায় তাহলে, সে কাফির হয়ে যাবে। অনেক কথা আছে, যাকে কালিমায়ে শিরক বা কুফর বলে। অনেকে না জানার দরুণ এসব বলে নিজের ঈমান নষ্ট করে ফেলে।

যেমন, কারো ছেলে মারা গেলে যদিও তা বেদনাদায়ক, কিন্তু আসলে এটাতো এক দিক দিয়ে অনেক বড় রহমত। কারণ- সে বড় হলে দ্বীনদার হত, না বদদ্বীন হত, তা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু যদি ছোট অবস্থায় মারা যায় এবং এখন মা-বাপ সবর করে থাকে, তো হাদীসের মধ্যে গ্যারান্টি দেয়া আছে যে, এই ছেলে অবশ্যই সুপারিশ করে মুমিন বাপ-মাকে জান্নাতে নিবে।

অথচ অনেক মা বোন না জেনে উল্টো আল্লাহর বিরুদ্ধে অবজেকশন করে বলে-আল্লাহ! তুমি কি আমার ছেলেটাই দেখলে? আমার বাপকেই চোখে দেখলে? আর কাউকে চোখে দেখলে না? একথা যদি সে সত্তর বছর ইবাদত করার পরও বলে-তাহলে একথা বলার সাথে সাথে তার সত্তর বছরের ইবাদত সব মাটি হয়ে যাবে। সে যত নামায পড়ে থাকুক, যত কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে থাকুক, সব বরবাদ হয়ে যাবে, এক জাররাহও কাজে লাগবেনা। নতুন করে আবার তার ঈমান আনতে হবে। ব্যাপারটা খুবই জটিল।

ঈমানে প্রত্যেকটি জিনিষ বিশ্বাস করা জরুরী। একটাকেও যদি কেউ অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। এ কারণেই বেহেশতী জেওরের শুরুতেই আক্বীদার মাসআলাগুলো লিখা হয়েছে। এ ছাড়া মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (রহ.) অনূদিত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর প্রণীত কিতাব তা'লীমুদ্দীন কিতাবের শুরুতে আক্বীদার বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, কি কি বিষয়ে আক্বীদা পোষণ করতে হবে। এসব বিষয় জানার জন্য মাওলানা থানবী (রহ.) এর রকয়েকটি কিতাব অধ্যায়ন করা অত্যান্ত জরুরী। কিতাবগুলো হলোঃ বেহেশতী জেওর, তা'লীমুদ্দীন, ফুরুউল ঈমান। এর

জন্য কিতাবুল ঈমান পড়াও উপকারী।

আজকাল এমন অনেক কিতাব বের হয়েছে, যেগুলো অধ্যায়নের পূর্বে যদি কোন মুহাক্কিক আলেমকে না দেখানো হয় এবং পড়ে বিশ্বাস করা হয় তাহলে দ্বীনদারী যা ছিল তাও বরবাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তাই যার-তার লিখা কিতাব পড়া যাবে না। উলামায়ে কিরাম থেকে জেনে নিয়ে তবেই পড়তে হবে। আক্বীদা দুরস্ত করার জন্য যে সব কিতাবের নাম বললাম সেগুলো খুবই নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া কওমী মাদ্‌রাসা গুলোতে মালাবুদ্দা মিনহু নামক যে কিতাব পড়ানো হয়, তার শেষ ভাগে কিতাবুল ইহসান নামক এক অধ্যায় আছে, কোন কোন কথা বলার দ্বারা ঈমান চলে যায় তা সেখানে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুযোগ হলে সেটা দেখে নেয়া অত্যাবশ্যকীয়।

দ্বিতীয় বিষয় : ইবাদত

হাদীসে শরীফে আছে-রীতিমত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, সতীত্বের হিফাজত করা, স্বামীর আনুগত্য ও খিদমত করা এ চার কাজ যারা করবে আমার উম্মতের সে সমস্ত মা-বোনদের জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশের খোশ খবরী দাও। কাজেই এই নামায রোযার ব্যাপারে কোন শিথিলতার অবকাশ নেই। আপনি আপনার ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ সবার প্রতি নজর রাখবেন। আপনাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তা'লীম তারবিয়াতের দায়িত্ব আপনাদের। একজন মা যদি আল্লাহ ওয়ালী হয়ে যায় তাহলে পুরা খান্দান আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে। একজন নেককার মা মানেই একটি আদর্শ মাদ্‌রাসা। বাপকে আদর্শ মাদরাসা বলা যায় না। কারণ বাপরা বিভিন্ন দায়িত্বের কারণে বাহিরে বাহিরে ঘুরে বেড়ায়। ছোট বেলায় ছেলে মেয়রা ৭/৮ বছরতো মায়ের কাছেই থাকে। মা যদি আল্লাহ ওয়ালী হয় তার সুহবতে বাচ্চারা শিশুকালেই আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাবে। দ্বীনী নসীহত তার মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। যখন এই ছেলে-মেয়েগুলো বড় হবে তখন তার মনে আসতে থাকবে যে, আম্মা এই কথাগুলো বলে ছিলেন। শৈশবের কথা শিশুদের দিলে এত রেখাপাত করে যা কোন উস্তাদদের কথায় করে না।

একজন মা যদি দ্বীনদার হয় তাহলে পুরা পরিবার দ্বীনদার হয়ে যাবে। স্বামীর ভিতরেও দ্বীনদারী এসে যাবে। এরকম অনেক ঘটনা আছে যে, স্বামী আগে নামায পড়তো না, দাড়ি রাখতো না, কিন্তু স্ত্রীর কারণে সে দাড়ি রেখেছে, নামায ধরেছে, পুরা দ্বীন তার ভিতরে চালু হয়ে গেছে। আমাকে অনেক ছেলের অভিভাবক এসে বলে হুযুর! ছেলেকে মাদরাসায় ভর্তি করানো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ছেলের মায়ের কারণে মাদরাসায় ভর্তি করতে নিয়ে এসেছি। স্কুলে ভর্তির আকুন্ঠ ইচ্ছা থাকা সত্তেও তার মায়ের কারণে মাদরাসায় ভর্তি করতে এনেছি। চিন্তা করে দেখুন, মায়ের জাতি! আল্লাহ পাক সকল ক্ষমতা আপনাকে দিয়েছেন। আপনার কারণে ছেলে আল্লাহ ওয়ালা হবে, ইলম ওয়ালা হবে, দ্বীনদার হবে। আজ মা-বোনদের মধ্যে জরুরী ইলম না থাকার কারনে সন্তানরা বদ্বদীন হয়ে যাচ্ছে। স্বামীরা ও দীনদার হচ্ছে না। যখন কোন শিশু মায়ের কাছে জামা চাইবে, মা যদি দ্বীনদার হয় তাহলে শিশুকে বলবে-দেখ আব্বু, জামা দেয়ার শক্তিতো আমার নেই, তুমি বরং নামায পড়ে আল্লাহকে বল, হে আল্লাহ! আমার জামার ব্যবস্থা করে দিন, দেখবে আল্লাহ তোমার আব্বুর পকেটে টাকা দিয়ে দিবেন এবং তোমার আব্বু তোমার জামা বানিয়ে দিবেন। এভাবে যে কোন জিনিস দু'আ করে আল্লাহর কাছে চাইতে বলবে। ভেবে দেখুন! একজন মাতা কিভাবে তার সন্তান কে আল্লাহওয়ালা বানাতে পারে এবং আল্লাহ যে একমাত্র দেনেওয়ালা জাত সেই বিশ্বাস কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে বদ্ধমূল করতে পারে।

নামায সহীহ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুরাহ ও মাসআলা মাসায়িল শিখে নিবেন। নিজেও নামায পড়বেন এবং পরিবারে যারা আছে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ সবাইকে শিখাবেন। রমযানে রোযা রাখবেন, সবাইকে রাখতে বলবেন। মাসিকের কারণে যে রোযাগুলো কাযা হয় তা হিসাব করে নিজেতো রাখবেনই সাথে সাথে মেয়েদেরকে রাখতে বলবেন।

আর আপনাদের কাউকে যদি আল্লাহ পাক মাল দান করেন, তাহলে সে মালের যাকাত প্রদান করতে হবে। অনেক মা-বোনদের এত অলংকার দেয়া হয়, স্বামী দেয়, বাপে দেয়, আরো অনেকে দিয়ে থাকে-যার দরুণ তার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যায়। যদি শুধু স্বর্ণ থাকে আর কিছু

না থাকে তাহলে সাড়ে সাত ভরি বা তার বেশী হলে সম্পূর্ণ অলংকারের বিক্রি মূল্যের উপর যাকাত ফরজ হবে। এখন ঐ অলংকারের প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়া ফরজ। যদি তার পিতা বা স্বামী তার অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তারা না দিলে ঐ অলংকার বিক্রি করে তাকে যাকাত দিতে হবে। আর যদি স্বর্ণ রৌপ্য উভয় ধরনের মাল থাকে, অথবা স্বর্ণ ও নগদ অর্থ থাকে তখন কিন্তু নেসাব হওয়ার জন্য সাড়ে সাত ভরি লাগবে না। তখন দেখতে হবে সোনা, রোপা, ক্যাশ টাকা মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপার মূল্য অর্থাৎ বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে আনুমানিক দশ হাজার টাকা অথবা তার কাছাকাছি হয় কি-না? যদি হয় তখন যাকাতও দিতে হবে, সদকায়ে ফিতির দিতে হবে, কুরবানীও করতে হবে।

হজ্বের মাসআলা হলো-যদি এই পরিমাণ টাকা জমে যে, যাতায়াত সহ থাকা-খাওয়া হয়ে যাবে, শুধু এতটুকুই নয় বরং সাথে যাবার মত মাহরাম আল্লাহ পাক মিলিয়ে দেন তখন মেয়েদের উপর হজ্ব ফরজ হয়ে যায়। যদি স্বামী বা মাহরাম না পাওয়া যায় তাহলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে অতঃপর বদলী হজ্বের ওসীয়ত করবে। যদি বলে আমার বোন বা বান্ধবী হজ্বে যাচ্ছে তার সাথে তার স্বামী আছে, তথাপি তাদের সাথে হজ্বে যাওয়া তার জন্য জায়িয নাই। দু'তিনজন মহিলা মিলে গেলেও জায়িয হবেনা। ভগ্নিপতির সাথেও হজ্বে যাওয়া জায়িয হবে না কারণ ভগ্নিপতি মাহরাম না। নিজের খান্দানের দ্বীনদার মাহরাম হতে হবে। ফেৎনার কারণে অন্যান্য মাহরামদের সাথে যেতে ফুকাহাগণ কর্তৃক নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয়ঃ মু'আমালাত

মু'আমালাত যথাযথ হওয়া পুরুষের জন্য যেমন জরুরী তেমনি মহিলার জন্যও। অর্থাৎ রিযিক ও সব রকম লেন-দেন হালাল হওয়া। যত রকম কেনা-কাটা ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে সব মু'আমালাতের অন্তর্ভূক্ত। এক কথায় আমরা বলি হালাল রিযিক। রিযিক হালালের ব্যাপারে স্বামী যেমন তৎপর থাকা জরুরী তেমনি স্ত্রীর জন্যও। এটা বলা যাবে না যে স্বামী কোত্থেকে আনে আমি তার কি জানি? এমনতো হতে পারে যে, স্বামী

মাসআলাই জানেনা, অথবা স্ত্রীকে এমন টাকা দিয়েছে যা তার জন্য হালাল নয়। প্রয়োজনে তার থেকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে, তিনি হালাল পদ্ধতিতে উপার্জন করছে না হারাম তরীকায়। কোন হারাম রিযিক যদি স্বামী স্ত্রীকে খাওয়ায় তাহলে হাদীসে এসেছে, হারাম রিযিক দ্বারা যে রক্ত গোশত তৈরী হবে তা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। কাজেই স্বামী রিযিক কোত্থেকে উপার্জন করছে তা স্ত্রীকে যাচাই করতে হবে। স্বামীকে বলে দিতে হবে খবরদার! হারামের দিকে যাবেন না। কষ্ট করে জীবন- যাপন করতে রাজী আছি কিন্তু হারাম উপার্জন দিয়ে ভোগ-বিলাসীতা করতে রাজী নই। এটা অনেক মা-বোন বুঝে না। তারা স্বামীর উপর এত চাপ সৃষ্টি করে যে স্বামী বাধ্য হয়ে হারাম পন্থায় উপার্জনের রাস্তা খুঁজতে থাকে। যখন সে দেখে হালাল রিযিক দ্বারা জীবন বাসনা পূরণ করা যাচ্ছে না, তখন সে নাজায়িয তরীকায় পয়সা কামানো শুরু করে। খবরদার! এটা একটা হক। স্ত্রীর যে সকল হক আছে স্বামীর ব্যাপারে, তা পিছে চাপ সৃষ্টি করা কোন স্ত্রীর জন্য জায়িয নয়। স্বামীর কোন মাল তার অনুমতি ছাড়া ব্যয় করাও স্ত্রীর জন্য জায়িয নয়। এভাবে রিযিক যেন হালাল থাকে তার বেশী বেশী খেয়াল রাখতে হবে। এব্যাপারে স্বামীকেও সহযোগিতা করতে হবে যাতে তিনি আখিরাতের বরবাদ করে দুনিয়ার আয়েশের দিকে না যান।

চতুর্থ বিষয়ঃ মু'আশারাত

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে মু'আশারাত বা পারস্পরিক সকল হক বজায় রাখা। কার সাথে কি ব্যাবহার করতে হবে, কার প্রতি কি করণীয়, কার কি অধিকার? ইসলামের এসব বিধানই হচ্ছে মু'আশারা। সকল মুসলমানের হক যথার্থভাবে আদায় করতে হবে। দ্বীনে ইসলাম সকলকে শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেককে অন্যের অধিকার আদায়ে তৎপর থাকতে হবে। কেউ যেন অন্যের হক আদায় করা থেকে চোখ বন্ধ করে নিজের হক উসুল করার জন্য তৎপর না থাকে, যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেকে অন্যের ব্যাপারে তৎপর থাকলে কোন আন্দোলন ছাড়াই সকলের হক উসুল হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীর হক আদায়ে তৎপর হবে অপরদিকে স্ত্রী স্বামীর হক আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে। এভাবে সকলেই অন্যের ব্যাপারে তৎপর হবে

এটাই ইসলামের শিক্ষা। আর তখনই দুনিয়াতে জান্নাতী পরিবেশ কায়েক হবে এবং কোন ঝগড়া ফাসাদ থাকবে না। তন্মধ্যে প্রথম নাম্বার হচ্ছে মাতা-পিতা। আল্লাহ-রাসূলের পরই পিতা-মাতাই সন্তানের নিকট অধিক সদ্ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত। এমনকি বাপ যদি কাফের হয় এবং তাকে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত দেখা যায়, তাহলে ছেলের প্রতি বাপকে কতল করা জায়িয এবং শরীআতের মাসআলাও এরূপ, তবে ভাল হল তখন নিজে কতল না করে অন্যকে দিয়ে করানো। এজন্য উলামায়ে কিরাম লিখেন-সবচেয়ে বড় হকদার হলেন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ ও রাসূরের হুকুম একই। আল্লাহ যা বলেন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাখ্যাসহ তা-ই বলেন এবং হাতে কলমে দেখিয়ে দেন। আল্লাহ-রাসূলের পরে আমাদের প্রতি সবচেয়ে বড় হকদার হলেন পিতা-মাতা। কাজেই তাদেরকে আরাম পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব। তারা বেঁচে থাকলেও সাতটি হক, আর মারা গেলেও সাতটি হক।

তার পর মা-বোনদের জন্য সবচেয়ে বেশী হকদার হলেন তার স্বামী। তাকে মান্য করা খুব জরুরী। এটা ছাড়া তাদের বেহেস্তে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। নিজের শক্তি সামর্থ দিয়ে তাঁর জায়েয হুকুম মান্য করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য এক রিওয়ায়েতের মধ্যে এসেছে-যে স্ত্রী তার শক্তি সামর্থ থাকা সত্তেও তার মনোপূত না হওয়ার দরুণ স্বামী কথা শুনলনা এবং তার নাফরমানী করল তার জন্য দুটি ধমকী এসেছেঃ (১) তার কোন ইবাদত কবূল হবে না-যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীকে সন্তুষ্ট না করবে। (২) সমস্ত ফিরিশতা তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে জান্নাত-জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে কুসুফ পড়ছিলেন তখন তাঁকে নামাযে জাহান্নামে দেখানো হয়েছে। হুযুর(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন আমি জাহান্নামের মধ্যে আমার উম্মতের মহিলাদেরই বেশী দেখলাম। জাহান্নামের মধ্যে ধনীরা আর নারীরা বেশী। হুযুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন-তার এক নাম্বার কারণ হলো, তারা স্বামীর না-শুকরী করে। এমন কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেনঃ "কারো স্বামী যদি এক দীর্ঘকাল স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলে, এর পর কোন এক ঘটনায় তার মন রক্ষা না করতে পারে, তখন মহিলারা স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়-তোমার থেকে আমি কোন কল্যাণ দেখতে পেলাম না। " এ কথা রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন বলতে ছিলেন? মেয়েদের বদনাম গাওয়ার জন্য? না, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পরীক্ষা মূলক জন্মগত ভাবে একটা খাসলত দিয়েছেন, যাতে করে এই খাসলতের বশীভূত হয়ে তারা ভুলের দিকে না যায়, সে দিকে তামবীহ বা সতর্ক করার জন্য নবী (আঃ) কথাটি বলেছেন। অনেকে বুঝতে পারে না, বলে যে, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত বড় কথা বললেন, আমাদের সাথে একযুগ ভাল ব্যাবহার করার পর একটা উল্টা করলে, আমরা সব মাটি করে দেই! এতে আমাদের দুর্নাম হয়ে গেল। তাদের ধারণা ভুল। রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্নামের জন্য বলেন নি। বরং প্রত্যেকটি মা-বোনদেরকে সতর্ক করার জন্য বলেছেন। এজন্য জায়েযের গন্ডির ভিতর থেকে স্বামীকে খুশি করার ফিকিরে থাকতে হবে। এটা স্বামীর হক। অধিকাংশ মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, সামান্য সামান্য কারণে অন্যকে লা‘নত করে, অভিশাপ দেয়, বদ দু‘আ করে। এসব থেকেও মহিলাদের সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

স্বামীর আরেকটা হক রয়েছে। তা হলো স্ত্রীর পর্দায় থাকা। বাপের বাড়িতে স্ত্রী যাদের সাথে দেখা দিতে পারতো, যেমন দাদা, বাপ, ভাই, চাচা, ভাতিজা, নানার বাড়িতে নানা মামা ভাগ্নে। বিয়ের পর স্বামীর সাথে তো দেখা দিতে পারবেই-কারণ, স্বামীর সাথে পর্দা করার কোন হুকুমই নেই। আপন শশুরেরর সাথেও দেখা দিতে পারবে। তার খিদমত করতে পারবে। কিন্তু তার গায়ে স্পর্শ করে খিদমত করা জায়িয নাই। যথা-মাথায় বা গায়ে তেল মালিশ করে দেওয়া, হাত-পা বা মাথা টিপে দেওয়া প্রভৃতি জায়িজ নাই এবং এর দ্বারা মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। পুত্রবধু পুত্রের জন্য স্থায়ীভাবে হারামও হয়ে যেতে পারে। স্পর্শ করা ছাড়া যে সব খিদমত সম্ভব, তা করতে পারবে। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর কারো সাথে দেখা করতে পারবেনা। খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, চাচাতো ভাই, দেবর-ভাসুর, দুলা ভাই, স্বামীর পিতা ছাড়া অর্থাৎ আপন শ্বশুর ছাড়া অন্যান্য শ্বশুর যেমন, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর

উকীল বাপ, ধর্ম বাপ ইত্যাদি- এদের সাথে দেখা দেয়া হারাম। হ্যাঁ, তারা যদি বেড়াতে আসে তাহলে আড়াল থেকে তাদেরকে মেহমানদারী করবে। তাদের সামনে গিয়ে কুশল বিনিময় করা শরী'আত কোন নারীকে অনুমতি দেয় নি। এটা শরী'আতের বিধান।
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন- আজকাল যে সব অনুষ্ঠান হচ্ছে, যেমন বিয়ে-শাদী, জন্ম উৎসব, মেয়েরা যেতে পারবে না। সংশয় নিরসনে কাছদুছ সাবীলের মধ্যে শেষের দিকে একটি বয়ান তিনি এনেছেন যে, শরী'আত তো মা-বোনদের জন্য বিয়ে-শাদী জিয়াফত অনুষ্ঠানে যাওয়া না-জায়িয বলেনি, কিন্তু বিভিন্ন ফিৎনা ফাসাদের কারণে ফুকাহায়ে মুতাআখখিরীন এটাকে নিষেধ করেছেন। আর একথাও তিনি লিখেছেন আজ থেকে ৬০ বছর পূর্বে। বর্তমান অবস্থাতো আরো নাজুক। অবশ্য যখন এ সমস্ত অনুষ্ঠান নিরিবিলিতে হয় এবং পর্দা বজায় রাখা সম্ভব হয় তো ভিন্ন কথা। তবে শর্ত হলো সেখানেও যেন কোন বে-পর্দা ও বে-শরার প্রশ্রয় না থাকে। বর্তমান যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয় তা সম্পূর্ণরূপে পর্দা বিবর্জিত। কোন মতেই সেখানে পর্দা করে চলবো, তাহলে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য। এটা আমাদের বহু পর্যবেক্ষিত ব্যাপার।
সন্তানরেদও হক রয়েছে। সন্তানের হক কি? তারা যখন জন্ম গ্রহণ করবে, তাদের সুন্দর নাম রাখা। আজকাল যেসব নাম রাখা হয়, যেমন- লতা পাতা সেন্টু মন্টু এসবই অনৈসলামিক নাম। হাদীসের মধ্যে এসেছে- যে সকল মা-বাবা সন্তানদের এ ধরনের নাম রাখে, তাদেরকে ছেলের নাম ধরে ডেকে হাশরের ময়দানে শাস্তি দেয়া হবে। এজন্য সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখতে হবে। এটাও সন্তানের একটি হক।
আর দ্বিতীয় হক হচ্ছে-ছেলে হোক, মেয়ে হোক তাদেরকে দ্বীন শিখাতে হবে। এটা মা-বাবা উভয়ের উপর ফরজ। সন্তান যেন সহীহ-শুদ্ধ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে, জরুরী মাসআলা-মাসায়িল জানতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। পরন্তু আলেম বানাতে পারলে এর থেকে খোশ কিসমতী আর কিছু নেই। কিন্তু যদি আলেম না বানানো যায়, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু মাসআলা-মাসায়িল তো তাকে অবশ্যই শিখাতে হবে যে টুকু দ্বারা সে দ্বীনের উপর চলতে পারে। এতটুকু না হলে ঐ মা-বাবার

পরকালে কঠিন বিপদে পড়তে হবে।
হাদীসে ঘটনা পাওয়া যায় যে, একবাপ তার ছেলের বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা.) কাছে অভিযোগ নিয়ে এলো যে-এ ছেলে আমাকে কষ্ট দেয়। হযরত উমর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তোমার বাপকে কেন কষ্ট দাও? বাপের হক আদায় করোনা কেন? ছেলে জবাব দিলো-আব্বা তো আমার হক আদায় করেন নি। কারণ বাপ যে কি জিনিষ, বাপের কি হক তা আমি জানিনা। বাপকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন-তুমি ছেলেকে এলম শিক্ষা দাও নি? সে বলল-জ্বি-না। হযরত উমর (রা.) বললেন-তুমি আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমিই তো প্রথমে ছেলের উপর জুলুম করছো। বলা বাহুল্য ছেলে মেয়েকে দ্বীন না শিখালে তারা যে গোনাহ করবে সেগুলি শুধু ছেলে-মেয়ের গুনাহ হবে না বরং বাপ-মার উপরে তা বর্তাবে।
সারকথা, এ ভাবে সকলকে সকল হক আদায় করতে হবে। বাপ-মায়ের হক, সন্তানের হক, স্ত্রীর হক, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের হক ইত্যাদি কয়েকটি হকের কথা বলা হলো। বাকিগুলো দেখে নিবেন হযরত থানবী (রহ.) এর লিখিত হুকুকুল ইসলাম কিতাবে-যা আদাবে জিন্দেগী নামে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।

পঞ্চম বিষয়ঃ আত্মশুদ্ধি অর্জন

৫টি বিষয়ের সর্ব শেষ বিষয় হল-নিজের দিলের রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকা ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। দিলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা জন্ম গতভাবে কিছু রোগ দিয়েছেন, আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। প্রত্যেকের দিলে দুনিয়ার মহব্বত আছে। পুরুষ হোক বা নারী হোক! আসবাবের প্রতি খুব বেশী মায়া। একটা কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে, এত মনোক্ষুন্ন হয়-যা বলার মত নয়। অথচ মুহব্বত তো আখিরাতের জন্য থাকা উচিত। দুনিয়ার মুহব্বত তো ক্ষণিকের জন্য। এসকল জিনিস চলে গেলে পড়তে হবে ইন্নাল্লিল্লাহ-। ছেলে মরে গেলে, এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে গেলে সবর করতে হবে, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। তাছাড়া যেটা ক্ষতি হয়ে গেল তার মালিক আমি না। বরং তার মালিক আল্লাহ। আমার মালিকও আল্লাহ। আমার সকল আসবাবের মালিকও আল্লাহ। তিনি তার মালিকানার মধ্যে এটা করেছেন, সেখানে আমাদের আপত্তির কি অধিকার

আছে? কাজেই ক্ষতি হয়ে গেলে অনেকেই হা-হুতাশ করে। কিন্তু যারা ইন্নালিল্লাহী-এর অর্থ বুঝে, তারা কোন হা- হুতাশ করে না। এর অর্থ, আমি এবং আমার যা কিছু আছে, সব আল্লাহর। সবই তো আল্লাহর জিনিস। আল্লাহই এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। আমি এর কি সিদ্ধান্ত নিব? আমাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কে দিয়েছে? আমি কি এর মালিক? সিদ্ধান্ত দিবেন আল্লাহ। যে ইন্নালিল্লাহী এর অর্থ বুঝে, সে এই কথাই বলে থাকে- তিনি মাওলা, যা সিদ্ধান্ত নিবেন আমি তা-ই মেনে নিব। এ রকম মনোভাব রাখলে সমস্ত মুশকিলাত হালকা হয়ে যাবে। এই পঞ্চম পয়েন্ট হলো এ জাতীয় দিলের রোগের ব্যাপারে সচেতন হওয়া। এমনি ভাবে আমরা কিছু ভাল কাজ করলেই মনে মনে চেয়ে থাকি যে, সুনাম হোক। এটাকে বলে রিয়া। আর এই একটি রোগের কারণে শহীদ আলেম ও দানশীলকে কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আমাদের মধ্যে বে সবরী আছে, দুনিয়ার মুহাব্বত আছে। অনেকের মধ্যে বড়াই আছে। অনেকে খুব বড়াই করে নিজের অংলকার-জেওরের সৌন্দর্যের আর বাড়ী-ঘরের।

যার দিলে যাররাহ পরিমাণ বড়াই থাকবে, হাদীসে এসছে-যতক্ষণ পর্যন্ত তার এই বড়াইয়ের শাস্তি না হবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য সকলকে আমি বলব-ইমাম গাযালী (রহ.) একটি কিতাব আছে, যার নাম তাবলীগে দ্বীন। তার বাংলা হয়েছে। এই কিতাবটি যদি আপনি মাঝে মাঝে পড়েন, তাহলে দিলের কি কি রোগ আছে, তা আয়নার ন্যায় আপনার চোখে ধরা পড়ে যাবে। তখন কোন আল্লাহওয়ালা শাইখ ও মুরুব্বীকে জানিয়ে রুহানী চিকিৎসা নিয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করা সহজ হয়ে যাবে। এক-রাগ যার কারণে মানুষ কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। এক রাগের জন্য ঝগড়া হয়-যার ফলে তালাক পড়ে। তার পর অনেক রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। এই রাগ কিভাবে কন্ট্রোল করবেন, এর ব্যবস্থা ঐ কিতাবে লিখা আছে, তা পড়ে নিবেন। অবশ্য নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করা যায় না শাইখের সুহবত ও পরামর্শ ছাড়া। এই পাঁচটি বিষয় খিয়াল রাখবেন। এতে দুনিয়ার জিন্দেগীও সুখ-সমৃদ্ধিতে কেটে যাবে। কবর-হাশরেও আল্লাহ তা'আলা ইজ্জতের সাথে রাখবেন।

বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি

বিবাহ মজলিস অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই মহর নির্ধারিত হয়ে যাবে। মেয়ের অভিভাবক মেয়ের নিকট থেকে আগেই দুই বিষয়ের অনুমতি নিয়ে রাখবে। প্রথমতঃ প্রস্তাবিত ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিবাহে সম্মত আছে কিনা দ্বিতীয়তঃ উক্ত অভিভাবক মেয়ের উকীল হিসেবে বিয়ের মজলিসে ছেলের নিকট মেয়ের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। অতঃপর বিবাহের মজলিসে যদি সম্ভব হয় তাহলে মেয়ের পিতা বা ভাই বা অভিভাবক নিজেই খুতবা পড়ে মেয়ের উকীল হিসেবে ছেলেকে প্রস্তাব দেবেন। আর মেয়ের পিতা যদি খুতবা পড়তে না পারেন তাহলে ছেলের পিতা বা অন্য কোন আলেম সাহেব বিবাহের খুতবা পড়বেন। খুতবার পরে মেয়ের অভিভাবক নিজে ছেলের কাছে প্রস্তাব দেবেন যে, আমি আমার অমুক মেয়েকে এত টাকা দেন মোহরের বদলে তোমার নিকট বিবাহ দিচ্ছি বা বিবাহ দিলাম। তখন ছেলে বলবে আমি কবুল করলাম। ঈজাব এবং কবুল একবার বলাই যথেষ্ট। অনেক স্থানে তিনবার বলানো হয়। এর কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি এমন হয় যে, মেয়ের অভিভাবক নিজে ছেলেকে প্রস্তাব দিতে পারেন না, তাহলে যিনি খুতবা পড়াবেন মেয়ের পক্ষ থেকে তাকেই অনুমতি দিয়ে দেবেন যে, আপনি আমার অমুক মেয়ের বিবাহ এত টাকা মোহরের বিনিময়ে এই ছেলের সাথে করিয়ে দিন। সেক্ষেত্রে আলেম সাহেব আগে খুতবা পড়বেন তারপরে মেয়ের উকিল হিসাবে ছেলের নিকট প্রস্তাব করবেন যে, আমি এত টাকা মহরের বিনিময়ে অমুকের অমুক মেয়ের বিবাহ আপনার সাথে দিচ্ছি – আপনি রাজি আছেন বা কবুল করলেন? ছেলে স্পষ্ট আওয়াজে বলবে যে, আমি কবুল করলাম। তার এই কবুল বলাটা যেন কমপক্ষে দুইজন স্বাক্ষী শুনতে পান সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলে কবুল বলার পরে উপস্থিত সকলে তাদেরকে হাদীসে বর্ণিত দু'আ দিবেন। বারাকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অনেক জায়গায় বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে সালাম করে। এর কোন প্রয়োজন নেই। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে হাজেরীনদের মধ্যে খুরমা বন্টন করে দেয়া হবে। অতঃপর দু'আ ও মুনাজাতের মাধ্যমে মজলিশ শেষ করা ভাল।